Nastikkyabad Nipat Jak (Allahr Astitter Proman)

Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১৫ মার্চ ২০১৫
First Print: 1st March 2015)
Compose and PDF Creater Mohd. Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Nastikkyabad Nipat Jak (Allahr Astitter Proman), Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st March 2015 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 50/- (Twenty Rupise Only)

উৎসর্গ

সর্বকালের মহান দার্শনিক, সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ, হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামীদ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এঁর প্রতি এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম ।

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য ।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মাদীনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম, যিনি রাহমাতুল্লিল আ-লামিন, সাইদুল মুরসালীন, সাফিউল মুজনাবীন । যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী, শান্তির দুত, মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং কিয়ামতের দিন কঠিন হাশরের ময়দানে আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপীদের জন্য সুপারিশকারী । যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবী সৃষ্টি, সমগ্র ব্রম্ভান্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে মহান আল্লাহ পাক নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রকাশ করতেন না ।

সালাম নিবেদন করি সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সমস্ত ফেরেস্তা (আঃ), সমস্তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), সমস্ত তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (রহঃ), চার মাযাহাবের চার ইমাম (রহঃ) এবং সমস্ত ওলী আওলিয়া-গওস-কুতুব (রহঃ)-এঁর প্রতি ।

সালাম নিবেদন করি, পীরানে পীর বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এঁর প্রতি, খাজা মইনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহঃ) এঁর প্রতি, শেখ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এঁর প্রতি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এঁর প্রতি, হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এঁর প্রতি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এঁর প্রতি । যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ।

'নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক' এই নামকরণ দেখেই পাঠকবর্গ বুঝতে পারছেন যে পুস্তকটি কোন বিষয়বস্তুর উপর লেখা । এই পুস্তকে নাস্তিকদের কয়েকটি যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে । এবং ধর্ম তথা ইসলামই ধর্মই যে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তা

আপনারা বুঝতে পারবেন । এবং মহান আল্লাহ বলে যে একজন মহান শক্তিধর স্রষ্টা এই ব্রম্ভাণ্ডে দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে ।

ভূমিকাতে বেশী কিছু বলব না আপনারা এই পুস্তক পড়ুন আর নিজেই বিচার করুন নাস্তিক্যবাদ কি কোন মতবাদ না বিজ্ঞানবিরোধী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাল্পনিক ভোগবাদী বস্তুবাদীদের সমাজকে শোষন করার একটি হাতিয়ার ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভূল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভূল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম

দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

+৯১ ৯১৫৩৯৭৭২৬৩

E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান

১) নং সন্দেহ ঃ নাস্তিকক্যবাদীরা বলেন, আল্লাহ নেই । কারণ আল্লাহকে দেখা যায় না । আর যা দেখা যায় না তা অস্তিত্বহীন । আল্লাহর অস্তিত্ব যদি থাকত তাহলে নিশ্চয় আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যেত । যেহেতু আল্লাহকে দেখা যায় না সেজন্য এই ব্রহ্মান্ডে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই । এই বিশ্ব স্বতস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে ।

সন্দেহের নিরসন ঃ এটা কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয় যে যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব নেই । যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব নেই - এই কথা ঠিক হলে আমরা মানুষের মনকে, বাতাসকে, ইথার তরঙ্গকে, তারের ভিতর বিদ্যুৎকে দেখতে পাই না । তাবলে কি তাদের কোন অস্তিত্ব নেই । অবশ্যই এদের অস্তিত্ব আছে যা কোন নাস্তিকের বাচ্চা অস্বীকার করতে পারে না ।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা মোট পাঁচটি । যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক । চোখ দিয়ে আমরা আলো বা কোন বস্তু দেখি, কর্ণ দিয়ে আমরা শব্দ শুনতে পাই, নাসিকা দিয়ে আমরা গন্ধের ঘ্রাণ পাই, জিহ্বা দিয়ে আমরা কোন বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করি এবং ত্বক দিয়ে আমরা শীত, গ্রীষ্ম, স্পর্শ, ব্যাথা - বেদনা অনুভব করি ।

একটি ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে না । যেমন, চোখ দ্বারা আমরা গন্ধ, ব্যাথা-বেদনা, স্পর্শ, স্বাদ অনুভব করতে পারি না, কান দ্বারা স্বাদ, গন্ধ বুঝতে পারিনা, নাক দ্বারা দেখা যায় না, ত্বক দ্বারা স্বাদ অনুভব করতে পারি না । সুতরাং এককথায় একটি ইন্দ্র অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করে না ।

এই পাঁচটি ইন্দ্র দ্বারা আমরা পাঁচটি বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান পাই । তা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর সন্ধান পাই না । ষষ্ঠ বস্তুর সন্ধান পাই না । আমাদের যদি চারটি ইন্দ্রিয় থাকত তাহলে আমরা এই ব্রহ্মান্ডের চারটি বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান পেতাম পঞ্চমটার পেতাম না । তাই কান না থাকলে শুনতে পেতাম না, চোখ না থাকলে দেখতে পেতাম না, নাক না থাকলে ঘ্রাণ অনুভব করতে পারতাম না, জিহ্বা না থাকলে স্বাদ অনুভব করতে পারতাম না, ত্বক না থাকলে ব্যাথা বেদনা, আঘাত, স্পর্শ অনুভব করতে পারতাম না । সেজন্য আমরা একটা ইন্দ্রিয় না থাকে আমরা সেই ইন্দ্রিয়ের কাজকে অস্বীকার করে বসতাম । যেমন অন্ধ মানুষ দেখতে পায় না

বলে দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার, কালা মানুষ শব্দের অস্বীকার করে । আবার দেখা যায় আমাদের গৃহপালিত জন্তুরা সুনামী (জলোচ্ছাস) ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ বুঝতে পারে কারণ তা বোঝার যে ইন্দ্রিয় তা সেই জন্তুদের মধ্যে আছে, পক্ষান্তরে মানুষের সে ইন্দ্রিয় না থাকার জন্য মানুষ তা বুঝতে পারে না । প্রজাপতি বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে দুরবর্তী সঙ্গীকে সংকেত পাঠাতে সক্ষম কিন্তু মানুষ তা পারে না । যেমন নাস্তিকের বাচ্চারা আল্লাহকে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুভব করতে না পেরে অস্বীকার করে বসেছে ।

সুতরাং একথা মনে করার কোন প্রয়োজন নেই যে মানুষ আল্লাহকে দেখতে পায় না এবং তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি না বলে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই । এই মহাবিশ্বের রহস্য অপার এবং আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে নেই । সে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করার ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে থাকলে আমরাও আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম ।

কথিত আছে, জনৈক দরবেশকে এক নাস্তিক যুবক প্রশ্ন করল ঃ-

১) আপনারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা সব জায়গায় বিরাজমান । অথচ আমি কোথাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না । দয়া করে আমাকে দেখিয়ে দিন ।

২) আপনারা বলেন, ইবলিশ শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি, আর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবার জাহান্নামের আগুনেই ফেলা হবে । তাহলে আগুন আগুনকে কিভাবে পুড়াবে বা শাস্তি দিবে ?

৩) আপনারা বলেন, মানুষ যা করে, আল্লাহই করান । তাহলে পাপ কর্মের জন্য মানুষ দোষী হবে কেন ?

শুনে দরবেশ সাহেব কোন উত্তর না দিয়ে মাটির একটি ঢিল তুলে যুবককে লক্ষ্য করে মারলেন । তাতে যুবক প্রচন্ড আঘাত পেল । সে তখন কাজীর কাছে গিয়ে দরবেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, আমি দরবেশকে তিনটি প্রশ্ন করায় তিনি তার উত্তর না দিয়ে আমায় ঢিল মেরেছেন । আমার শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা হয়ে গেছে ।

কাজী সাহেব দরবেশকে বললেন, আপনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঢিল মেরেছেন কেন ? উত্তরে দরবেশ সাহেব বললেন, আমি ঐ এক ঢিলেই তার তিনটি

প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। যুবক বলল, সেটা কিভাবে ? দরবেশ যুবককে ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তুমি আল্লাহকে দেখতে চেয়েছ। আর তুমি বলছ, তোমার সমস্ত শরীরে ব্যাথা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার শরীরে তো কোথাও ব্যাথা দেখতে পাচ্ছি না। তুমি প্রথমে তোমার ব্যাথাটা দেখিয়ে দাও, তারপর আমি তোমাকে আল্লাহ দেখিয়ে দেব। জেনে রাখ, ব্যাথা যেমন চোখে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়, আল্লাহকেও তেমনি চোখে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়। বাকি দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন মাওলানা নজরুল হক সাহেবের 'কুট প্রশ্নের উত্তর' দ্বিতীয় খন্ড।

২) নং সন্দেহ ঃ এই প্রশ্ন শুনে অনেকে বলেন, আল্লাহ থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু নিশ্চয়তা তো নেই। না থাকতেও তো পারে। তখন ধর্ম কর্ম করে জীবন বেকার হয়ে যাবে। নামায - রোজা করে জীবন বর্বাদ হয়ে যাবে। তাই গোটা বিষয়টি অনিশ্চিত এবং সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং পরকালের অনিশ্চিত সুখের আশায় দুনিয়ার নিশ্চিত সুখকে বিষর্জন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি।

সন্দেহের নিরসন ঃ উক্ত প্রবাদ বাক্যটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ওটা কেবল ঐখানে প্রযোজ্য, যেখানে নিশ্চিত বস্তুর প্রতিদানে অনিশ্চিত বস্তুটি সমান হয়। কিন্তু যেখানে আমরা নিশ্চিত বস্তুর প্রতিদানে অনিশ্চিত বস্তুটি বহুগুনে বেশী পাওয়ার আশা বা সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ঐ প্রবাদ বাক্যটি খাটে না। আমরা এবং বস্তুবাদীরাও বাস্তব জীবনে এই রকম বহু অনিশ্চিত বস্তুর আশায় নিশ্চিত বস্তুকে কুরবানী করি বা বিষর্জন দিই। যেমন, দশ টিন ধান জমিতে বীজ করার জন্য ফেলে দিই এবং চাষের জন্য হাজার হাজার টাকা অগ্রিম খরচ করি অনিশ্চিত ফসলের আশায়। অথচ এই ফসল নাও হতে পারে। দশ টিন নষ্ট করে হাজার টিন পাওয়ার আশাতেই এটা করা হয়। চাষীর চিন্তাধারা - 'যদি দৈবাৎ ফসল নাই হয়, তবে মাত্র দশ টিন ধান যাবে, কিন্তু যদি হয়েই যায়, তখন অন্য লোকেরা হাজার টিন পেয়ে লাভবান হবে, আর না পাওয়ার আফশোষে আমার বুক ফেটে যাবে। সুতরাং একটা ঝুঁকি নেওয়াই যাক।'

অনুরুপ ভাবে লাখ টাকার আশায় লটারীর টিকিটে একটাকা খরচ করে, দুরারোগ্য ব্যাধী থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় তিক্ত ঔষধ সেবন করে ও টাকা খরচ করে, ভালো চাকুরীর আশায় পড়াশুনার পিছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে, অমূল্য মুক্তা সংগ্রহের আশায় জীবন পণ করে সমুদ্রে ডুব দেয়, টাকা উপার্জনের

আশায় ব্যাবসা উপলক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেয় এবং হীরা উত্তোলনের আশায় জীবন তুচ্ছ করে গভীর খাদে নামে । অথচ এ সবই অনিশ্চিত আশা । এইভাবে যাঁরা ঝুঁকি নিয়ে চাষ করে, ব্যাবসা করে, পড়াশুনা করে, সমুদ্র পাড়ি দেয় ও গভীর খাদে নামে, তাদিকে কেউ বোকা বলে না, বরং বুদ্ধিমান ও অধ্যাবসায়ী বলে তাদের প্রশংসা করে । যারা ঝুকি না নেয়, বরং তাদেরকেই লোকে বোকা বলে ।

.......ঠিক তেমনি, দুনিয়ার জীবন মাত্র সত্তর বছরের, আর পরকালের জীবন অনন্ত । সুতরাং যদি জান্নাত-জাহান্নাম দৈবাৎ নাই থাকে, তবে আমি মাত্র সত্তর বছরের জন্য কষ্ট পেলাম । আর যদি থেকেই থাকে, তবে অনন্ত পরকালের জন্য ঠকলাম । তখন ধার্মিকদের জান্নাতে যাওয়া দেখে যে আফশোষ হবে, সেই আফশোষ বুকে নিয়ে জাহান্নামে পুড়তে হবে অনন্তকাল । সুতরাং জীবনের কয়েকটা দিন একটু ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি এবং এটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ ।

তাছাড়া আসল কথা হচ্ছে - আখেরাতের প্রতি আমার ইমান দোদুল্যমান নয়, বরং নিরেট । আখেরাত অবশ্যই আছে এবং তা নিশ্চিত । এতক্ষন যে যুক্তিগুলো দিলাম, তা তোর কুমন্ত্রণার ও কূটপ্রশ্নের উত্তর মাত্র । যেমন, হযরত আলী (রাঃ) তর্কের খাতিরে এক কাফেরকে বলেছিলেন, যদি তোমার কথাই সত্য হয় ও পরলোক বলে কিছু না থাকে, তবে তুমি, আমি-আমরা দুজনেই মুক্তি পাব । কিন্তু যদি আমার কথা সত্য হয় ও হিসাব কিতাব হয়, তবে আমি মুক্তি পাব, কিন্তু তুমি গ্রেফতার হয়ে যাবে । আমি উভয় অবস্থাতায় মুক্তি পাচ্ছি, কিন্তু তুমি পাচ্ছ না । সুতরাং সর্বাবস্থায় মুক্তিলাভের পথ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি ?

আলী (রাঃ)-এর ঐ কথা বলার মানে এই নয় যে, তাঁর বিশ্বাসও দুর্বল ও দোদুল্যমান ছিল । বরং ওটা ঐ দুর্বল বিশ্বাসের কাফেরের জ্ঞানানুসারে তাকে বুঝান হয়েছিল । বস্তুতঃ আলী (রাঃ)-এর ইমান ছিল নিরেট ও মজবুত । .... তেমনি আমার ইমানও দুর্বল নয় বরং নিশ্চিত । সুতরাং বহু নিশ্চিত সুখের আশায় অল্প নিশ্চিত সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া আমার জন্য একান্ত জরুরী ।

বর্ণিত আছে ঃ একদল নাস্তিক একবার ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) এর সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে মুনাযারা (বিতর্ক) করতে চায় । তাদের দাবী ছিল- ‘আল্লাহ বলে কেউ নেই । মহাবিশ্ব আপনিই সৃষ্টি হয়েছে ও প্রাকৃতিক নিয়মে আপনিই চলছে ।’ ইমাম সাহেব মুনাযারা করতে সম্মত হলে মুনাযারার জন্য দিন

ধার্য্য করা হল । নির্দিষ্ট দিনে দোজলা নদীর অপর পারে মুনাযারা মঞ্চ তৈরী হল । হাজার হাজার জনতা মুনাযারা দেখার জন্য সমবেত হত । নাস্তিকরা বড় বড় কিতাব নিয়ে দলবলসহ মঞ্চে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উপস্থিত হল । কিন্তু ইমাম সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে পারলেন না । তখন নাস্তিকরা হাসাহাসি করতে লাগল ও বলতে লাগল, ইমাম সাহেব বোধ হয় ভয়ে আর আসবেন না ।

হঠাৎ দুই ঘন্টা দেরী করে ইমাম সাহেব একাই খালি হাতে সভায় হাজির হলেন । তখন নাস্তিকরা তাঁকে বলল, ইমাম সাহেব, আপনার মত লোকেরও দেখছি সময়ের জ্ঞান নেই । এতো দেরী হলো কেন ? উত্তরে তিনি বললেন, “ঠিক সময়েই আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম । কিন্তু নদীর ঘাটে এসে দেখলাম, নদীতে বন্যা এবং পারাপারের কোন নৌকা নেই । কি করে পার হব ? এ কথা চিন্তা করতেই হঠাৎ দেখলাম, একটি গাছ আপনা আপনিই কাটাই-ফাড়াই হয়ে বিনা মিস্ত্রিতেই একটি নৌকা তৈরী হল ও বিনা মাঝিতেই নৌকাটা লোক পার করতে লাগল । আমি সেই নৌকায় চড়ে পার হলাম । তাই এই দেরী ।” একথা শুনে নাস্তিকরা হো হো করে হেসে উঠল ও বলল, ‘ইমাম সাহেবের মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে । কারণ, বিনা মিস্ত্রিতে কখনো নৌকা তৈরী হয় ? না বিনা মাঝিতে কখনো নৌকা চলে ? আপনি পাগলের মত কথা শুনালেন যে ।’ তখন ইমাম সাহেব বললেন, ‘ঐ কথা বলার জন্য যদি আমি পাগলের মতো হই, তবে তোমরা সব বদ্ধ পাগল । কারণ, একটা সামান্য নৌকা যদি বিনা মিস্ত্রিতে তৈরী না হয় ও বিনা মাঝিতে না চলে, তবে এই মহাবিশ্ব কি করে বিনা মিস্ত্রিতে তৈরী হতে পারে ও বিনা মাঝিতে (পরিচালকে) চলতে পারে ? আমার দাবী যদি পাগলের মত হয়, তবে তোমাদের দাবী দেখছি বদ্ধ পাগলের মত ।- একথা শুনে নাস্তিকরা লা-জওয়াব হয়ে পালিয়ে গেল । মুনাযারায় তিনি বিজয়ী হলেন ।

‘.......তাই আমি বলছিলাম, এই বিশ্বে কোন কর্মই বিনা কর্তাই সম্পন্ন হয় না । যেখানেই কর্ম আছে, তার পিছনে কোন কর্তাও আছে । যেমন, কবিতার পিছনে কবি, শিল্পের পিছনে শিল্পী, রান্নার পিছনে রাঁধুনী, লেখার পিছনে লেখক, নাটকের পিছলে নাট্যকার, গানের পিছনে গায়ক, বিজ্ঞানের পিছনে বিজ্ঞানী, নিয়মের পিছনে নিয়ামক ও ঘরের পিছনে ঘরামী অবশ্যই বিদ্যমান আছে । তেমনি সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টা অবশ্যই মওজুদ আছেন । তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ । তাই আমার আল্লাহ-বিশ্বাস ও দোদুল্যমান নয়, বরং তা হচ্ছে সবল ও নিশ্চিত ।’*

* তথ্যসূত্র ঃ ইবলিসের বিষাক্ত ছোবল ও তার প্রতিকার, হযরত মাওলানা নজরুল হক

আল্লাহর স্রষ্টা কে ?

এ'কথা শুনে নাস্তিকরা বলে, 'ঠিক আছে, এখন দেখছি, তোমার কথা তোমাকেই খাচ্ছে (স্ববিরোধী) । তুমি বলছ, আপনা আপনি কোন কিছুই হতে পারে না । তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, আল্লাহ তায়ালা আপনা আপনি হলেন কি করে । তাহলে তাঁকে কে সৃষ্টি করল ? তিনি যদি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ নিজেই অস্তিত্ববান হতে পারেন, তাহলে এই বিশ্বই বা স্বয়ম্ভু হতে পারবে না কেন ? আর বিশ্ব যদি অস্তিত্ববান হওয়ার জন্য কারও মুখাপেক্ষি হয়, তবে আল্লাহও অস্তিত্ব লাভের জন্য কারও মুখাপেক্ষী হবেন । সুতরাং আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে .... আমি বলছি, প্রতিটি কর্মের পিছনে কর্তা অবশ্যই থাকবে, কর্তা ছাড়া কর্ম কখনো সম্পন্ন হয় না । আমি তো বলিনি যে, প্রত্যেক কর্তার পিছনে আবার কর্তা থাকবে । কর্তার পিছনে যদি আবার কর্তা থাকে তাহলে, তবে কর্তা আর কর্তা থাকে কোথায় ? কর্তা তখন কর্মের পর্যায়ে নেমে আসে ।

সেইজন্য কবি ছাড়া কবিতা অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না । কিন্তু কবির অস্তিত্বের জন্য আর কোন কবির প্রয়োজন নেই । কবির অস্তিত্বের জন্য যদি আবার একজন কবির প্রয়োজন পড়ে, তবে কবি আর কবি থাকেন না । তিনি তখন কবিতায় পর্যবসিত হন, আর শেষ জনই হবেন আসল কবি । ঠিক তেমনি, শিল্পের পিছনে শিল্পীর দরকার, কিন্তু শিল্পীর অস্তিত্বের জন্য আর কোন শিল্পীর দরকার হয় না । আর যদি দরকার হয়, তবে শিল্পী তখন শিল্পী থাকে না শিল্পের পর্যায়ে নেমে আসে । তখন কর্তা হয়ে যায় কর্ম ।

অনুরূপ ভাবে মহাবিশ্ব হচ্ছে সৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ কর্ম, আর আল্লাহ হচ্ছেন তার স্রষ্টা অর্থাৎ কর্তা । সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন । কিন্তু স্রষ্টার জন্য আর কোন স্রষ্টার প্রয়োজন হয় না । তার প্রয়োজন হলে স্রষ্টা আর স্রষ্টা থাকেন না, তখন তিনি সৃষ্টিতে পরিণত হন । আর স্রষ্টার স্রষ্টা তখন মূল কর্তা বা আল্লাহ হয়ে পড়েন ।

এইভাবে প্রশ্ন করতে থাকলে আবার প্রশ্ন আসবে, তাঁর আবার স্রষ্টা কে ? সুতরাং এই প্রশ্নের শেষ নেই । এই ধরণের প্রশ্নকে 'মানতিক' অর্থাৎ তর্কবিদ্যার ভাষায় 'তাসালসুলে দওর লাজেম' অর্থাৎ 'পুনরাবৃত্তি মূলক অবান্তর প্রশ্ন' বলে । এ প্রশ্ন বোকার প্রশ্ন । তাছাড়া ঐভাবে প্রশ্ন করতে করতে এক জায়গায় কোথাও

অবশ্যই শেষ হবে । আর শেষ প্রশ্নের উত্তরে যে স্রষ্টা পরিণত হবেন, তাঁকেই আমরা আল্লাহ বলি । বাকিরা আল্লাহ নন, তারা আল্লাহর সৃষ্টি ।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় । তা হচ্ছে- মহাবিশ্বে দু'রকম সত্ত্বা রয়েছে । একটাকে বলা হয় জাতি বা মৌলিক, আর দ্বিতীয়টাকে বলা হয় আরেজী অর্থাৎ কৃত্রিম । কৃত্রিম সত্ত্বা সব সময় মৌলিক সত্ত্বার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু মৌলিক সত্ত্বা কারও উপর নির্ভশীল নয় । কৃত্রিম সত্ত্ব মৌলিক সত্ত্বা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না, কিন্তু মৌলিক সত্ত্বা নিজে নিজেই অস্তিত্ববান । এ কারও কাছে ঋণী নয় ।

যেমন একটি রৌদ্রতপ্ত লোহার বলের উত্তাপটা কৃত্রিম, বলটা এই তাপ সূর্যের কাছে পেয়েছে, সে সূর্যের কাছে ঋণী । কিন্তু সূর্য কারো কাছে তাপ নিয়ে গরম হয়নি, তার তাপ নিজস্ব ও মৌলিক । সে কেবল অপরকে তাপ দেয়, কিন্তু কারো কাছে তাপ নেয় না ।

তেমনি, কোন বস্তুকে রাখার জন্য একটি জায়গা বা স্থানের প্রয়োজন, কিন্তু স্থানকে রাখার জন্য কোন স্থানের প্রয়োজন পড়ে না । স্থান হচ্ছে মৌলিক । এ অন্য বস্তুকে ধারণ করে, কিন্তু নিজে কারো উপর ভর করেনা ।

আমরা কলম দ্বারা লেখি । কলমকে চালায় আঙ্গুল, আঙ্গুলকে চালায় হাত, হাতকে চালায় শরীরের পেশী, আর পেশীকে চালায় প্রাণ । এবার যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রাণকে কে চালায় ? তবে আর উত্তর পাওয়া যাবে না । কারণ, প্রাণ হচ্ছে মৌলিক এবং কলম, হাত ও পেশী হচ্ছে কৃত্রিম । কলম, হাত ও পেশী পরিচালক ছাড়া চলতে পারে না, কিন্তু প্রাণ নিজেই চলে, বরং অপরকে চালায় ।

আমরা জানি, মুরগী ছাড়া ডিম পাওয়া যায় না, আর ডিম ছাড়া মুরগীও জন্ম নিতে পারে না । এটা প্রকৃতিক নিয়ম । কিন্তু পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ডিম এসেছিল না মুরগী - এ প্রশ্ন থেকেই যায় । যদি উত্তরে বলা হয়-মুরগী, তবে প্রশ্ন আসবে, সেটা কোন ডিমের বাচ্চা ? আর যদি বলা হয়-ডিম, তবে প্রশ্ন হবে, সেটা কোন মুরগীর ডিম ?

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সকলকেরি মেনে নিতে হবে যে, মুরগী কিংবা ডিম-দুটোর মধ্যে যে কোন একটার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল । যদি প্রথমে ডিম এসেছিল,

তবে সেটা বিনা মুরগীর ডিম । আর যদি মুরগী এসেছিল, তবে সেটা বিনা ডিমের মুরগী । ঐ সর্বপ্রথম ডিমটা বা মুরগীটা হচ্ছে মৌলিক, আর বর্তমান মুরগী ও ডিমগুলো হচ্ছে কৃত্রিম । বর্তমান ডিম ও মুরগীগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল- তাই কৃত্রিম । আর সর্বপ্রথম ডিমটা বা মুরগীটা কারও উপর নির্ভরশীল ছিল না- তাই ওটা মৌলিক ।

এইভাবে গাছ ও বীজের প্রশ্নটাও আসে । গাছ আগে না বীজ আগে ? ঐ সূত্র অনুযায়ী বর্তমান গাছ ও বীজগুলি কৃত্রিম, তাই গাছ বীজের উপর ও বীজ গাছের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম যে গাছ অথবা বীজটা এসেছিল, সেটা ছিল মৌলিক, তাই সেটা অন্য কিছুর উপর নির্ভশীল ছিল না । সেটা বিনা বীজে কিংবা বিনা গাছে উদ্ভুত ।

.......উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কৃত্রিম সত্তা অপরের মুখাপেক্ষী, কিন্তু মৌলিক সত্তা কারও মুখাপেক্ষী নয় । আমরা তথা সারা বিশ্ব হচ্ছে কৃত্রিম । তাই সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা । কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন মৌলিক সত্ত্বা, তাই তাঁকে সৃষ্টি করার জন্য কারও প্রয়োজন নেই । তিনি স্বয়ম্ভু । তিনিই বরং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ।

.......এতক্ষন পর্যন্ত আমি সূর্যের তাপকে, স্থানকে, প্রাণকে এবং প্রথম ডিম মুরগী, গাছ ও বীজকে মৌলিক সত্ত্বা বলে এলাম-এ কেবল উদাহরণের জন্য । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওগুলোও মৌলিক সত্ত্বা নয় । সূর্যের তাপ, প্রাণের শক্তি, প্রথম ডিম, মুরগী, গাছ ও বীজ - সবই আল্লাহর সৃষ্টি । সুতরাং এই মহাবিশ্বে প্রকৃত মৌলিক সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ । তাছাড়া সারা বিশ্বই হচ্ছে কৃত্রিম ও আল্লাহর সৃষ্টি । সবাই আল্লাহর কাছে ঋণী । আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, আর সবই সৃষ্টি । আল্লাহই একমাত্র কর্তা, বাকী সবই কর্ম ।

বর্ণিত আছে, নাস্তিকরা একবার ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সভা করে । তাদের একজন বক্তা আস্তিকদের বিরুদ্ধে চারটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় । যথাঃ

১) আল্লাহ এখন কি করছেন ?
২) আল্লাহ এখন কোথায় আছেন ?
৩) আল্লাহর মুখ কোন দিকে ?
৪) আল্লাহর আগে কে ছিল ?

তারপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল, কোন মাওলানা যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে দিতে পারে, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব ।

সেই সভায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) গোপনে যোগদান করেছিলেন । তিনি প্রশ্ন শুনে তৎক্ষনাৎ মঞ্চে গিয়ে বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব ইনশাল্লাহ । বক্তা বলল, উত্তর দিন । তিনি বললেন, উত্তর দেওয়ার আগে একটি কথা আছে । তা হচ্ছে- তুমি প্রশ্ন করেছে, আর আমি উত্তর দেব । আমরা জানি, প্রশ্ন করে ছাত্র, আর উত্তর দেয় গুরু । সুতরাং এ ব্যাপারে আমি তোমার গুরু ।

অতএব আমি তোমাকে জ্ঞান দেব, অথচ তুমি চেয়ারে বসে থাকবে, আর আমি দাঁড়িয়ে উত্তর দেব- এটা শোভা পায় না । সুতরাং প্রথমে তুমি ছাত্রের মতো করে নীচে নেমে বস, তারপর আমি গুরুর মত চেয়ারে বসে উত্তর দেব । নাস্তিক বেচারা এই অকাট্য যুক্তি কাটতে না পেরে নীচে নেমে বসল, আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) চেয়ারে উঠে বসলেন ।

তারপর তিনি উত্তর দিতে শুরু করলেন ।

বললেন, ১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ এখন কি করছেন ?- এর উত্তরে আমি বলব, আল্লাহ তায়ালা এইমাত্র একজন সম্মানী মানুষকে সম্মান দিয়ে চেয়ারে বসালেন ও একজন নিকৃষ্ট মানুষকে অপমান করে চেয়ার থেকে নামিয়ে নীচে বসালেন । এটাই এখন করলেন ।

২য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ এখন কোথায় আছেন ?- এর উত্তরে আমি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করছি, তার প্রাণটা কোথায় ? হাতে, না পায়ে, না চোখে, না মাথায় ? প্রশ্নকারী বলল, প্রাণ শরীরের সমস্ত অঙ্গেই সমান ভাবে বিরাজমান । ইমাম সাহেব বললেন, তেমনি আমার আল্লাহও মহা বিশ্বের সব জায়গায় সমানভাবে বিরাজমান ।

৩য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহর মুখ কোন দিকে ?- এর উত্তরে ইমাম সাহেব একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মোমবাতির মুখ কোন দিকে ? প্রশ্নকারী বলল, এর মুখ বা আলো চারিদিকেই । তিনি বললেন, তেমনি আল্লাহও হচ্ছেন নুর, তাঁর নুরের আলো সবদিকেই ।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ আল্লাহর আগে কে ছিল ?- এর উত্তরে আমি প্রশ্নকারীকে ১০০ থেকে ১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো উল্টোদিকে গুনতে বলছি । প্রশ্নকারী বলতে লাগল-

১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭ - - - - - ৫, ৪, ৩, ২, ১ । তারপর সে চুপ হয়ে গেল । ইমাম সাহেব বললেন, চুপ হলে কেন ? একের আগে কি আছে গুনতে থাক । প্রশ্নকারী বলল, একের আগে তো কিছু নেই, এক থেকেই তো শুরু । ইমাম সাহেব বললেন, তেমনি আল্লাহ হচ্ছেন এক, তাঁর থেকেই সব শুরু । সুতরাং তাঁর আগে আবার কে থাকবে ? তখন নাস্তিক বেচারা পরাজয় স্বীকার করল ও মুসলমান হয়ে গেল ।

তখন ইবলিশ (ও তার চ্যালা নাস্তিকরা) পুনরায় বলে, 'ঠিক আছে, তোমার কথা বুঝা গেল, আল্লাহ বলে একজন অবশ্যই আছেন এবং তিনি স্বয়ম্ভু । কিন্তু তিনিই যে এই বিশ্বের পরিচালক- সেটা তুমি অনুমান করলে কিভাবে ? তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, জগতে যা কিছু ঘটে চলেছে, তার পিছনে কোন না কোন একটা প্রাকৃতিক কারণ কাজ করছে । বিজ্ঞানীরাও বলেছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে । যেমন, বৃষ্টি হওয়ার কারণ মেঘমালা, ঝড় হওয়ার কারণে গভীর নিম্নচাপ, জ্বর হওয়ার কারণ ঠান্ডা লাগা, রোগ ভালো হওয়ার কারণ ঔষধ, বাচ্চা জন্ম হওয়ার কারণ নর-নারীর মিলন । সুতরাং এখানে কাজের কারণটাই হবে তার কর্তা । তবু তুমি আল্লাহকেই পরিচালক বা কর্তা বলছ কোন হিসাবে ?'

এর উত্তরে ইবলিশকে (ও নাস্তিকদেরকে) বলতে হবে, "....আল্লাহ তায়ালা তাঁর এবং কাজের মাঝখানে কারণকে পর্দা হিসাবে রেখেছেন । তিনি এই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছেন বান্দার ইমান পরীক্ষা করার জন্য । তাই প্রতিটি ঘটনার পিছনে কারণ অবশ্যই থাকবে । তা বলে কারণ কখনো কর্তা হতে পারে না । কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কারণের পিছনে আবার কারণ পাওয়া যায়, তারও আবার কারণ থাকে । এইভাবে চলতে চলতে যে কারণের কোন কারণ থাকে না, সেটাই হবে মূল কারণ । আর মূল কারণকে কারণ না বলে কারক অর্থাৎ কর্তা বলাই ঠিক । আর সেই কর্তাই হচ্ছেন আল্লাহ ।

যে কারণের পিছনে আবার কারণ পাওয়া যায়, তা কর্ম পদ । আর যে কারণের পিছনে আর কোন কারণ থাকে না, তা কর্তৃ পদ । কেননা, কর্ম হচ্ছে কারণে অবশ্যম্ভাবী ফল । সুতরাং যে কারণের পিছনে আবার একটি কারণ থাকে, সেই কারণটা পূর্ব কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল । তার মানেই পূর্ব কারণের ফলে সংঘটিত কার্য । যেমন, ফসল ভালো হওয়ার কারণ ভালো বৃষ্টিপাত, আর ভালো বৃষ্টিপাতের কারণ নিম্নচাপ । এখানে বৃষ্টিপাত একদিকে ফসল ভালো হওয়ার কারণ, অপরদিকে নিম্নচাপের ফল অর্থাৎ নিম্নচাপের কারণে সংঘটিত কার্য । তাই

বলছিলাম, যে কারণের পিছনে আবার কারণ পাওয়া যায়, তা আর কারণ না থেকে কার্যের পর্যায়ে নেমে আসে । কিন্তু যে কারণ শেষ কারণ, যার পিছনে আর কোন কারণ থাকে না, তাই হচ্ছে মূল কারণ, আর তাকেই তখন কারণ না বলে কারক বা কর্তা বলাই ঠিক । সুতরাং প্রমাণিত হল, কারণ হচ্ছে কর্মপদ, আর মূল কারণ বা কারক হচ্ছে কর্তৃপদ ।

আমি ইতিপূর্বে 'স্রষ্টার স্রষ্টা কে ?'- এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমাণ করেছি যে, কর্মের জন্য কর্তার প্রয়োজন, কিন্তু কর্তার জন্য আর কোন কর্তার প্রয়োজন হয় না । সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন । স্রষ্টার জন্য আর কোন স্রষ্টার দরকার হয়না । স্রষ্টা হচ্ছেন জাতি বা মৌলিক সত্ত্বা, আর সৃষ্টি হচ্ছে আরেজী বা কৃত্রিম সত্ত্বা । কৃত্রিম সত্ত্বা মৌলিক সত্ত্বার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু মৌলিক সত্ত্বা কারও উপর নির্ভরশীল নয় । তেমনি কারণ হচ্ছে কর্মপদ, তাই কৃত্রিম, আর কারক হচ্ছে কর্তৃপদ, তাই মৌলিক । এইজন্য কারণের জন্য কারক বা কর্তার প্রয়োজন আছে । কিন্তু কর্তার জন্য আর কোন কর্তার দরকার নেই । সেই জন্য সব কাজের ও সব কারণের মূল কারক আল্লাহ, তিনিই মৌলিক, তিনিই অনাদি-অনন্ত, তিনিই কর্তা, তিনিই পরিচালক ।

আল্লাহ তায়ালা কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে ফেরেস্তাকে তার নির্দেশ দেন । তখন সেই কাজ সংঘটিত হওয়ার জন্য যে কারণ দরকার, নির্দেশপ্রাপ্ত ফেরেস্তা সেই কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে সৃষ্টি করে দেন । তারপর ঐ কাজটি সংঘটিত হয় । ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন নাস্তিক বিজ্ঞানীরা কাজের পিছনে কেবল প্রাথমিক কারণটাই দেখতে পায় । তার উপরের দিকে আর তাদের দৃষ্টি যায় না । তাই তারা প্রাথমিক কারণকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মকেই মূল কারণ অর্থাৎ কর্তা মনে করে । কিন্তু প্রাথমিক কারণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের পিছনে আবার কার হাত আছে- তা তারা দেখতে পায় না । তাদের দৃষ্টান্ত ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন একটি পিপীলিকার মত ।

যেমন, একটি পিঁপড়ে খাতার উপর চলতে চলতে দেখতে পেল- কাগজের উপর একটি সুন্দর ফুল অঙ্কিত হচ্ছে । সে এর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য উপর দিকে মাথা তুলল, একটি কলমের দ্বারা এটা অঙ্কিত হচ্ছে । তখন সে ফুল অঙ্কনের জন্য কলমকেই মূল কারণ অর্থাৎ কর্তা বলে ঘোষনা করল । কিন্তু কলম চালিত হওয়ার পিছনেও যে একজন মানুষের হাত রয়েছে, সেটা সে দেখতে পেল না । কারণ, অতটুকু মাথা তোলার ক্ষমতা তার নেই । কিন্তু বড় প্রাণীরা দেখতে পাবে যে, ফুল অঙ্কনের মূল কারণ বা কর্তা হচ্ছে একজন মানুষ । অদূরদর্শী বিজ্ঞানীরাও

ঠিক ঐ পিঁপড়ের মত যে কোন ঘটনার প্রাথমিক কারণ বা কারণসমূহকে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে, মূল কারণে পৌঁছাতে পারে নি । এই জন্য বিজ্ঞানীদের কথাকে সম্পূর্ণ সত্যও বলা যাবে না, আর সম্পূণড় মিথ্যাও বলা যাবে না । বরং তাকে আংশিক সত্য বলা যায় । তাদের অনুমান অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায় ।.............

এবার হয়ত কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ যেহেতু সারা বিশ্বের মূল পরিচালক এবং তিনি সর্বশক্তিমান, তাহলে তিনি কাজগুলিকে সরাসরি নিজের কুদরতে সম্পন্ন না করে কারণের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন কেন ?

তার উত্তরে বলব, আল্লাহ তায়ালা ইহলোককে দারুল আসবাব করে সৃষ্টি করেছেন । অর্থাৎ প্রতিটি কার্যই কার্য-কারণ সম্পর্কের সাথে জড়িত । আল্লাহ তায়ালা যে কোন কাজকে বিনা করণেও সরাসরি সম্পন্ন করতে পারেন । কিন্তু তিনি তা না করে সেই কাজটাকে কারণের উপর মওকুফ রেখেছেন । এ নিয়ম জগতের সর্বত্র বিরাজমান । আর এর কারণ হচ্ছে দুটি । যথা ঃ

১) আল্লাহ যদি প্রতিটি কাজকে কারণের উপর মওকুফ না রাখতেন, তাহলে ইমানদার বেইমান অর্থাৎ আস্তিক - নাস্তিক এর পরীক্ষা হত না । কারণ তখন সকলেই আল্লাহর অসীম কুদরতের সন্ধান পেয়ে তার উপর বিশ্বাস করে ইমানদার হয়ে যেত । ফলে জাহান্নামের আর প্রয়োজন হত না । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজের বা ঘটনার পিছনে একটি করে কারণকে অবশ্যই বিদ্যমান রেখেছেন । একেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে । আর নাস্তিকরা ঐ কারণ বা নিয়মকেই কাজের বা ঘটনার মূল হোতা বলে মনে করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে । কিন্তু কারণের বা নিয়মের মূল হোতা যে আল্লাহ, সেটা তারা বুঝতে পারেনা । নাস্তিকদের নজর থেকে আল্লাহ তায়ালা কারণের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন । কিন্তু সৌভাগ্যবান আস্তিক ব্যাক্তিদের কলবের নূর কারণের পর্দা ভেদ করে (রঞ্জন রশ্মির মত) আল্লাহর অদৃশ্য হাতের সন্ধান পায় ও প্রতিটি ঘটনার মূল কর্তা হিসাবে আল্লাহকেই দেখতে পায় । এইভাবে আল্লাহ তায়ালা নাস্তিক ও আস্তিকদের পৃথক করেন ।

২) আল্লাহ যদি এই নিয়মকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের কুদরতেই সবকিছু সম্পন্ন করেন, তবে হজতের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে । দুনিয়া আর দুনিয়া থাকবে না ।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিস্কার হবে । একদা মুসা (আঃ)-এর পেট ব্যাথা করছিল । তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহকে এ ব্যাপারে জানালে আল্লাহ বলেন, মুসা, তুমি (একটা গাছের নাম করে) অমুক গাছের শিকড় খেয়ে নাও, ভালো হয়ে যাবে । মুসা (আঃ) তাই করাতে তাঁর পেট ব্যাথা সেরে গেল ।

কিছুদিন পর আবার পেট ব্যাথা করতে লাগল । মুসা (আঃ) আর আল্লাহকে জিজ্ঞাসা না করেই ঐ জড়ি (ঐষধ) খেয়ে নিলেন । কিন্তু ব্যা সারল না । মুসা (আঃ) এ ব্যাপারে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ উত্তরে বললেন, 'হে মুসা, তুমি কি ভাবছো- ওষুধেই রোগ সারে ? তা সারে না । আমি যখন ওষুধকে বলি, কাজ কর, তখন সে কাজ করে । আর যখন হুকুম না করি, তখন ওষুধ কাজ করে না । যা হয়, আমার হুকুমেই হয় । ওষুধের কোন ক্ষমতা নেই ।'

কিছুদিন পর মুসা (আঃ) এর দারুন পায়খানা হতে লাগল । লোকেরা বলল, আপনি অমুক ওষুধ খান, ভালো হয়ে যাবেন । তিনি বললেন, আমি ওষুধ খাব না, কারণ, ওষুধের কোন ক্ষমতা নেই । আল্লাহর হুকুম হলে এমনিই ভালো হয়ে যাবে । আমি তার উপর তাওয়াক্কুল করলাম ।

এদিকে পায়খানা উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন । তখন জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন, "ইয়া কালি-মাল্লা-হ, আল্লাহ আপনাকে ঐ ওষুধটা খেতে নির্দেশ দিয়েছেন । ওতেই আপনার পায়খানা ভালো হবে । তা না খেলে আল্লাহ আপনার পায়খানা ভালো করবেন না । আর ঐ ওষুধ না খেয়ে মারা গেলে আপনি আত্মহত্যার পাপে জড়িত হবেন । তখন মুসা (আঃ) বাধ্য হয়ে ঐ ওষুধ খেয়ে আরোগ্য লাভ করলেন ।

তরপর মুসা (আঃ) আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয় আল্লাহ, তোমার ভেদ কিছু বুঝলাম না । তুমি নিজেই বললে, ওষুধের কোন ক্ষমতা নেই, যা করি আমিই করি । আবার ওষুধ না খেয়ে তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলেও তুমি নারাজ হচ্ছ । এর রহস্য কি ?'

আল্লাহ জবাবে বললেন, হে মুসা, তুমি কি তোমার তাওয়াক্কুলের দ্বারা আমার এই দুনিয়ার নাট্য-শালার নাটকের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে চাও ? অর্থাৎ আল্লাহ যদি কার্যকে কারণের উপর মওকুফ না রেখে নিজের কুদরতে সরাসরি সবকিছু সম্পন্ন করেন, তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় কারবার বন্ধ হয়ে যাবে । যেমন, তিনি যদি

বিনা ওষুধে অসুখ ভালো করে দেন, তাহলে ডাক্তারী ও ঔষধের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে । তিনি যদি স্বামী - স্ত্রীর মাধ্যমে ছেলে - মেয়ে না দিয়ে নিজের কুদরতে আদম (আঃ) এর মত সবাইকে সৃষ্টি করেন, তাহলে বিয়ে শাদী, ঘর সংসার কেউ করবে না । তিনি যদি বিনা পরিশ্রমে রুজি দান করেন, তাহলে চাষ - আবাদ, ব্যাবসা বানিজ্য, শিল্পকলা বন্ধ হয়ে যাবে । তিনি যদি আসমান থেকে কাপড় দান করেন, তাহলে কাপড়ের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে । এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ তার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র হারিয়ে ফেলবে । তখন দুনিয়া আর দুনিয়া না থেকে অন্য জগতে পরিণত হবে ।”

এখানে আরও একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ ‘হুয়াল আওয়ালো ওয়াল আখেরো ওয়াজ জা-হেরো ওয়াল বাতেন’ অর্থাৎ তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপনীয় ।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপনীয়-দুটোই একই সঙ্গে কিভাবে ও কেন ?

তার উত্তরে বলব, আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশ্যও নন। আর সম্পূর্ণ গোপনীয়ও নন । বরং দুটোর মাঝামাঝি । কিছুটা গোপন, কিছুটা প্রকাশমান । অর্থাৎ তাঁর জাত বা সত্ত্বা হচ্ছে গোপন, আর সিফত অর্থাৎ গুণাবলী হচ্ছে প্রকাশ্য । সিফাতের মাধ্যমে তাঁকে আবিস্কার করতে হয় । আর তাঁর সিফত অর্থাৎ গুনাবলী বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান । সৃষ্টি কৌশল নিয়ে চিন্তা গবেষনা করলে তাঁর গুণাবলী ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা যায় । গুণাবলী দর্শনের দ্বারা গুণাকরকে চিনতে পারা যায় । যেমন কবিতার দ্বারা কবিকে, শিল্পের দ্বারা শিল্পীকে, কর্মের দ্বারা কর্মীকে, সাহিত্যের দ্বারা সাহিত্যিককে চেনা যায়, তেমনি সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টাকে আবিস্কার করা যায় । প্রাকৃতিক নিয়মের পর্দার আড়ালে থেকে তিনি সারা জগতকে অদৃশ্য আঙ্গুলের ইশারায় পরিচালনা করছেন ।

হয়ত কেউ বলবেন, আল্লাহ তায়ালা পর্দার আড়ালে না থেকে বরং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে থাকলেই ভালো হত, তাতে সবাই ইমানদার হয়ে জান্নাতে যেতে পারত । কিংবা সম্পূর্ণ গোপন থাকলেও হত, তাতে মানুষ ইমান আনার দায় থেকে মুক্তি পেত ।

উত্তরে বলব, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ প্রকাশ্য বা সম্পূর্ণ গোপনীয় না হওয়ার দুটি কারণ আছে। যথা ঃ

১) কে আল্লাহকে না দেখে সিফাতের মাধ্যমে তার জাতকে মেনে নেয় ?- তার পরীক্ষা হত না।

২) সিফাতের মাধ্যমে স্রষ্টার জাতকে আবিস্কার করার একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যেত। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা পরিস্কার করা যাক ঃ

আমরা ছোট বেলায় একটা খেলা খেলতাম। তার নাম 'লুকলুকানি' খেলা। এই খেলায় দুটি পক্ষ থাকে। প্রথম পক্ষ লুকিয়ে পড়ে, দ্বিতীয় পক্ষ খুঁজে বের করে। যখন প্রথম পক্ষকে খুঁজে বের করতে দ্বিতীয় পক্ষের খুব কষ্ট হয়, তখন দ্বিতীয় পক্ষ চিৎকার করে বলে, একটা কুক দিবি তো দে, নয়তো খেলবই না। তখন প্রথম পক্ষ সরু গলায় একটা কুক দেয়। দ্বিতীয় পক্ষ কুক শুনে তার রা (শব্দ) এর অনুসরণ করে খুঁজতে থাকে। অবশেষে তাকে গোপন জায়গা থেকে বের করে ফেলে। যেই বের করে ফেলে, অমনি দ্বিতীয় পক্ষ 'পেয়েছি', 'পেয়েছি' বলে আনন্দে ও উল্লাসে চিৎকার করে উঠে।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ প্রথম পক্ষের আসল ইচ্ছাটা কি ? লুকিয়ে থাকা না আবিস্কৃত হওয়া। যদি বলে লুকিয়ে থাকা, তবে প্রশ্ন করব, সে কুক দিল কেন ? আর যদি বলে, আবিস্কৃত হওয়া, তবে প্রশ্ন করব, সে কুক না দিয়ে সরাসরি বেরিয়ে এল না কেন ?

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম পক্ষের ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ লুকিয়ে থাকাও নয়, আর হঠাৎ প্রকাশ হওয়াও নয়। বরং তার ইচ্ছা এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ তার কুক শুনে বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক পরিশ্রমের পর তাকে আবিস্কার করবে। তাতে সকলেরই আনন্দ হবে। এখানেই খেলায় সার্থকতা।

অনুরুপ ভাবে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন থাকতেও চান না, আর হঠাৎ করে প্রকাশ হতেও চান না। তিনি চান, বান্দা তাঁর কুক অর্থাৎ সৃষ্টি কৌশল ও সিফাত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে বহু পরিশ্রমের পর তার জাতকে আবিস্কার করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির আবেগে সে বলে উঠবে,

"আশহাদো আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ" অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ।" আর তিনিই সৃষ্টিলীলার সার্থকতা ।*

অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর

পাশ্চত্য দার্শনিকগণ বলেছেন, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে তাই প্রত্যক্ষ করা যায় । যেহেতু পাশ্চাত্ব দার্শনিকগণ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেননি সেজন্য তাঁরা আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন ।

বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক হযরত ইমাম গাজ্জ্বালী (রহঃ) অস্তিত্বকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । সেগুলি হল ঃ

১) 'অজুদে যাতী' অর্থাৎ প্রকৃত অস্তিত্ব যা প্রকাশ্য বিদ্যমান । যে সব জিনিস আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ্যে অনুভব করতে পারি ।

২) 'অজুদে হিস্সী' অর্থাৎ অনুভব অস্তিত্ব যা কেবল অনুভব শক্তির মাধ্যমে যা বোঝা যায় । যেমন - আমরা স্বপ্নে যা দেখি, তা অনুভব শক্তির দ্বারাই দেখে থাকি । পীড়িতাবস্থায়ও মানুষ অনুভব শক্তির দ্বারা বহু কিছু দেখতে পায় ।

৩) 'অজুদে খেয়ালী' বা কাল্পনিক অস্তিত্ব; যেমন - বন্ধুকে কেউ একবার মাত্র দেখে সে চক্ষু বন্ধ করে রইল । তথাপি কল্পনার চোখে বন্ধুর যে আকৃতিটা তার অন্তরে ভেসে রইল তারই নাম অজুদে খেয়ালী ।

৪) 'অজুদে আকলী' অর্থাৎ যৌক্তিক অস্তিত্ব । কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরুপের নাম 'অজুদে আকলী' বা যৌক্তিক অস্তিত্ব । যেমন - আমার আয়ত্বের কোন একটি বস্তুকে লক্ষ্য করে আমি বললাম যে, এ এখন সম্পূর্ণরুপে আমার হাতে । তার উদ্দেশ্য হাতে হওয়া নয় বরং শক্তির মালিকানা স্বত্ব প্রকাশ করা । সুতরাং ঐ শক্তি ও মালিকানা স্বত্বই হল হাতের 'অজুদে আকলী' ।

৫) 'অজুদে শেবহী' অর্থাৎ অনুরুপ অস্তিত্ব; অর্থাৎ মূল বস্তুটি নাই অথচ ঠিক তারই মতো অন্য একটি আছে ।

* তথ্যসূত্র ঃ ইবলিসের বিষাক্ত ছোবল ও তার প্রতিকার, হযরত মাওলানা নজরুল হক

পাশ্চত্য দার্শনিকগণ বলেছেন, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে তাই প্রত্যক্ষ করা যায় । যেহেতু পাশ্চাত্ব দার্শনিকগণ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেননি সেজন্য তাঁরা আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন ।

এইবার দেখি পাশচত্য দার্শনিকগণ যে বলেছেন, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' তাই আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা । হযরত ইমাম গাজ্জ্বালী (রহঃ) অস্তিত্বকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন তা উপরে উল্লিখিত করা হল । ২ নং বলা হয়েছে 'অজুদে হিস্‌সী' অনুভব অস্তিত্ব অর্থাৎ কেবল অনুভব শক্তির মাধ্যমে যা বোঝা যায় । সৃষ্টি বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আল্লাহর অস্তিত্ব আছে । অর্থাৎ আল্লাহর অস্তুত্বকে 'অজুদে হিস্‌সী' বা অনুভব অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় ।

৪ নংএ বলা হয়েছে 'অজুদে আকলী' অর্থাৎ যৌক্তিক অস্তিত্ব । এখন দেখুন এই 'অজুদে আকলী' অর্থাৎ যৌক্তিক অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা । যুক্তিবিদ্যার দ্বারাও আল্লাহর অস্তিত্বও এর আগে প্রমাণ করা হয়েছে । অর্থাৎ 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' হলেও আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা যায় ।

বিজ্ঞানীদের মতে আল্লাহর অস্তিত্ব

আজকের যুগে আমরা যেসব বিজ্ঞানীদের কিংবদন্তী বলে মনে করি তাঁরা অধীকাংশই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । তাঁরা কেউ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি । যেমন,

১) কিংবদন্তী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন, "যে অনন্ত উর্ধ্বতন আত্মা আমাদের ভঙ্গুর এবং দুর্বল মনের নিকট নিজেকে অতি সামান্য মাত্রায় বিকশিত করেন, তাঁর প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভয় মিশ্রিত প্রশংসাই আমাদের ধর্ম । একটা উচ্চতর বিচারশক্তি যা অবাধ্য বিশ্বে প্রকাশিত, তার অস্তিত্বে গভীর আবেগপূর্ণ বিশ্বাসই আল্লাহ সম্বন্ধে আমার ধারণা ।"

অন্য যায়গায় তিনি বলেছেন, "তুমি আমাদিগকে তোমারই জন্য সৃষ্টি করেছে । আমাদের আত্মা তাই যতক্ষণ না তোমাতে আশ্রয়লাভ করে ততক্ষণ অশান্ত থাকে ।" (চল্লিশজন বিজ্ঞানীদের মতে আল্লাহর অস্তিত্ব)

আলবার্ট আইনষ্টাইন আরও বলেছেন, "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমিত ও স্বল্প। মানুষ সৃষ্টি জগতকেউ বুঝে শেষ করতে পারেনি, সে তার সীমিত জ্ঞানে মহান স্রষ্টাকে বুঝবে কি করে?" (৫০ জন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার ইসলাম গ্রহণ, পৃষ্ঠা-৯)

২) কিংবদন্তী বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন বলেছেন, "একমাত্র চরম বুদ্ধিমান ও পরম ক্ষমতাশালী এক শক্তির নির্দেশেই সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং ধুমকেতুর এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ সৃষ্টি হতে পারে। অন্ধের যেমন বর্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তেমনি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ কিভাবে সকল বস্তু ধারণ করেন সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।" (চল্লিশজন বিজ্ঞানীদের মতে আল্লাহর অস্তিত্ব)

৩) ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রোমানেস তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে স্বীকার করে বলেছেন, "মহাবিশ্বকে কোন ক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে বোঝা যায় না।" (ঐ পুস্তক)

৪) বিজ্ঞানী টেনিসন বলেছেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বৈচিত্রময় পরিকল্পনার অধিকারী।" (ঐ পুস্তক)

৫) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানেস তাঁর মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে স্বীকার করে গেছেন, "মহাবিশ্বকে কোন ক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে বোঝান যায় না।"

৬) ১৯০০ বছর পূর্বে দার্শনিক সেন্ট পল বলেছেন, "আল্লাহর আদেশেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব দৃশ্য সমস্ত জিনিসই অদৃশ্য জিনিস থেকে তৈরী।"

বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ নুরুল ইসলামের গবেষণায় আল্লাহর অস্তিত্ব

বাংলাদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম লিখেছেন, "প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ আছেন কি ?

এ প্রশ্ন বড় জটিল ও সমাধানও কঠিন । এ নিয়ে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কোলাহল যুগে - যুগেই আছে ও থাকবে । মূর্খ চিরদিনই মূর্খ । সে তার জ্ঞানের, পরিসীমায় কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানী তার জ্ঞানালোকে তার দৃষ্টির সম্মুখে সব কিছুই উদ্ভাসিত দেখে । তাই অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থকেও বিশ্লেষন করে তার মধ্যে নিহিত রহস্য খুঁজে পায় । সামান্য দর্শন - জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় । তার গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে । কুশিক্ষা ও ভ্রান্তশিক্ষার যুগ কেটে গেছে । বিজ্ঞানের আলোকময় স্বর্ণযুগ এই বিংশ শতাব্দী । তাই চলুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে আমরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে চেষ্টা করি ।

জ্ঞানের অতি নিকটতম সীমা আমাদের অদৃশ্য আত্মা ও মন আর বহিঃসীমা নক্ষত্রজগতের অতলস্পর্শী গভীর স্থান । এই আত্মা ও মন নিয়ে আমি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি । নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করার জ্ঞান আমার নেই । তাই এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার মতো সাহস পাইনি । আত্মা ও মনকে নিয়ে দেখেছি যে এদের স্বরুপ ও স্থিতি নেই । তবুও এদের ওপরই জীবন নির্ভরশীল । এই জীবনকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি । জীবন জড় দেহকে সচেতন করে, আবার সচেতন দেহকে জড় পদার্থে রুপান্তরিত করে । বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই জীবনের সূচনা, স্থিতি ও স্বভাব লক্ষ্য করে অনেক মূল্যবান তত্ত্বই আমাদের জন্য রেখে গেছেন । আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো মহাবৈজ্ঞানিক এই জীবনকে উপেক্ষা করতে পারেননি । এই বিশিষ্টতা ও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে তাই তিনি বলেছেন ঃ

“যে মানুষ নিজের এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করে সে শুধু যে হতভাগ্য তাই নয়, অধিকন্তু তার জীবনের কোন মূল্যই নেই ।”

যদি জীবনকে উপেক্ষা না করা যায়, যদি জীবনের প্রয়োজনীয়তা প্রাণী মাত্রকেই স্বীকার করতে হয়, যদি জীবনের লীলাখেলা বাস্তব দৃষ্টিতেই অনুভূত হয় তবে এর স্বরুপ কি এবং সৃষ্টিকর্তা কে এ কথা প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায়ই দোলা দেবার কথা । আস্তিক - নাস্তিক, পন্ডিত - মূর্খ, ডাক্তর - কবিরাজ, বাদশাহ - ফকির, ধনী - গরীব কেউ যখন তার মূল্যবান জীবনকে ধরে রাখতে পারেনি, তখন এই জীবন রহস্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে স্বীকরা করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে ? জীবনকে যদি ধরে রাখবার কোন কৌশল থাকত তাহলে শাদ্দাদ তার

স্বনির্মিত বেহেশ্‌তেই আজীবন পরম সুখে কাটাত। আর ফেরাউনের 'আমি আল্লাহ' ঘোষণা জন্ম - জন্মান্তরেই অটুট থাকত। জীবন উপেক্ষার বস্তু নয়। জীবন কোন মানব দানবের হাতের মুঠোর মধ্যে নয়। জীবন পরীক্ষাগারের কোন ফলাফল নয় অথবা পরীক্ষার নিমিত্ত কোন উপাদানও নয়। এটা মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক উপাদান যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার আদেশেই নিয়ন্ত্রিত ও সৃষ্ট। আর এই সৃষ্টকর্তাই মহান আল্লাহ যিনি তাঁর মহাবাণীতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

'তিনি কল্যাণবর্ধক, যাঁহার হস্তে আধিপত্য এবং তিনি সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান ! তিনি (আল্লাহ) মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন - যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে তোমাদের মধ্যে অধিকতর সৎশীল এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।' (সুরা মুলক/৬৭ ঃ ১ - ২)

আল্লাহ আছেন কি ? - এ প্রশ্নের সমাধানের পূর্বে চলুন আমরা দেখি, আল্লাহ যে নেই এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। যদি এর উপযুক্ত প্রমাণ মেলে তাহলে আল্লাহ আছেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যাবে। আর যদি এর কোন প্রমাণ দাঁড় করানো না যায় তাহলে 'আল্লাহ নেই' বলে থাকে তাদেরকে বলতে হবে অবাস্তবাদী ও ভন্ড।

'আল্লাহ নেই' এর ওপর গবেষণা চলছে অনেক। ফলও পাওয়া গেছে বহুমুখী। খুব কমসংখ্যাক লোকের মনেই দোলা দিয়েছে যে আল্লাহ নেই। তাদের মনে এই দোলা কিন্তু স্থিতি লাভ করেনি। কারণ যখনই বিপদে পড়েছে তখনই মনে করেছে যে বিপদের সৃষ্টিকারী কোন অদৃশ্য শক্তি নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এর উদ্ভব হয় কোথা থেকে এবং একে অতিক্রম করাই বা যায় না কেন ? মেঘের গর্জন, অকস্মাৎ বজ্রপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অজন্মা, ঘুর্ণিঝড়ের তান্ডবলীলা এগুলো কি দৈবদুর্বিপাকের ফল, না বৃহত্তর শক্তিশালী কোন রাজ্যাধিপতির আদেশ ? যদি বলা যায় যে দৈবদুর্বিপাক, তাহলেও এই প্রশ্নের সমাধান হয় না। কেননা দৈবদুর্বিপাক ঘটনাকারী কোন শক্তি তবে এর পশ্চাতে নিশ্চয়ই কারো ইঙ্গিত বা আদেশের অপেক্ষা না করে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। কে তবে সেই সংঘটনকারী ? গায়ের জোরে, ধনের গর্বে, অহংকারের আস্ফালনে যখন এ দৈবদুর্বিপাককে রোধ করা যায় না তখন আল্লাহ নেই, কোন শক্তি নেই, কোন সংঘটনকারী নেই এসব কথা বলে তো পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যখন পরিত্রাণের কোন পথ নেই তখন সংঘটনকারী শক্তির কাছে মাথা নত করা ছাড়া অবিশ্বাসীদের কি আর কোন বুদ্ধি আছে ?

জন্মদানের ক্ষমতা, মৃত্যুদানের ব্যাপার এসব মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ নয় । যদি জন্মদানের ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকত তাহলে অসহায় মানুষ ইচ্ছামত দু - এক হাজার শক্তিশালী সন্তানের জন্ম দিয়ে একাই একটা রাজ্য ও সম্পদ সৃষ্টি করে নিত । কিন্তু পারেনি এবং পারবে না বলেই হাজার হাজার হাজার নৃপতি ঐশ্বর্য ও রাজত্বের বিনিময়েও সন্তানলাভ হতে বঞ্চিত হয়েছে । যদি ইচ্ছা করেই সৃষ্টির পদ্ধতিকে নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসা যেত তাহলে কেন গৃহপালিত পশু - পক্ষীর পেটে দু - একটির পরিবর্তে ডজন ডজন প্রসব করান হয়নি ও কেন খাদ্যসংকটের সমাধান করা হয়নি ? এসব প্রশ্ন 'আল্লাহ নেই' বলা ব্যাক্তির মাথা গোলা করে দেয় । অদৃশ্য নিয়ন্তা নেই, আল্লাহ নেই, সৃষ্টিকর্তা নেই, তবে কেন এসব প্রমাণের পক্ষপাতী হন ? বিরোধিতা করে নতুন প্রমাণ উপস্থিত করুন ও নতুন সৃষ্টি করে নতুন আল্লাহ নামের আখ্যা নিন ।

নাউজুবিল্লাহ, তর্কের খাতিরে ধরলাম যে আল্লাহ নেই । অর্থাৎ এ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন শাসক নেই । বেশ কথা । যদি তাই না থাকে তাহলে মানুষ তার যে কোন কার্যই ইচ্ছামতো সম্পাদন করতে পারে । যেমন, জনমানবহীন প্রান্তরে এক অদৃশ্য প্রাসাদের আপনি একাই মালিক । সেখানে আপনাকে বাধা দেবার আর কেউ নেই । তাহলে আপনার ইচ্ছামতো ঐ প্রসাদে যে কোন কার্যই আপনি করতে পারেন । যেমন, চারাগাছগুলো তুলে পূর্ব হতে পশ্চিমে লাগাতে পারেন । পুরানো ভাঙা ইটগুলো খুলে নতুন ইট সংস্থাপন করতে পারেন । প্রাসাদের আসবাবপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে আপনার পছন্দমতো ঠিক করতে পারেন । এক কথায় বলা যায় যে, আপনি তার একচ্ছত্র মালিক । প্রসাদকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে সেখানে ঘুঘু চরানোর ব্যাবস্থা করলেও কেউ আপনাকে বাধা দেবে না । এ অধিকারের নিয়ন্তাকেই বলা হয় সর্বাধিনায়ক । এবার আসুন বিশ্বের কাছে । বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নেই । একে রক্ষণাবেক্ষণের ভারও কারো ওপর নেই । তাহলে আপনিও ইচ্ছা করলে ফাঁকা মাঠে 'গোল' দিতে পারেন অর্থাৎ খেয়াল খুশি - মতো এ বিশ্বকে মালিকহীন প্রাসাদের ন্যায় ব্যাবহার করতে পারেন ও ভেঙে চুরে নতুন ভাবে সাজাতে পারেন । চলুন আপনার ক্ষমতাকে একবার দেখান এবং আপনি নিজেকে এ বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক বলে প্রমাণ করুন ।

কোটি কোটি বছর ধরে করুভুমি প্রখর সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এর বুককে শীতল করতে আবার কোটি কোটি বছরের জন্য মহাসাগরে রুপান্তরিত করুন । চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র একই দিকে ঘুরতে ঘুরতে একঘেঁয়ে ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে । তাদের মধ্যে নতুন শক্তি ভরে দিয়ে উলটোদিকে ঘুরিয়ে

দিন ও আপনার কারিগরি বিদ্যার পরিচয় দিন । পাহাড় - পর্বত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিষ্পকর্মা হয়ে উঠেছে । রকেটের গতিবেগ এদের দিয়ে সচল করে তুলুন । নির্জিব প্রাণী সজীব প্রাণী দ্বারা আঘাত পেতে পেতে জর্জরিত হয়ে উঠেছে । সজীবকে নির্জিব আর নির্জিবকে সজীব করে আপনার দয়ার ভান্ডার প্রদর্শন করুন । ধনীর নিষ্পেষণে গরিবের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছে । একবার দেশের বিত্তশালী লোকদের হাতে কাঙালের ঝুলি দিন আর নিপীড়িত মজলুমের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাজপ্রাসাদে তুলে দিন । খাদ্যাভাবে বিশ্বজুড়ো হাহাকার উঠছে; তাকে নিবারণ করতে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে আপনার শষ্য - ভান্ডার থেকে একবার খাদ্যের বন্যা বইয়ে দিন । নির্জিব পৃথিবীর পাহাড় - পর্বত, বৃক্ষরাজি ও মহাসাগরের চাপে অবসন্ন হয়ে পড়েছে । তাকে একবার অবসর দিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে উদ্যান রচনা করুন, পাহাড় - পর্বত সংস্থাপন করুন ও সাগরের বিপরীতমুখী স্রোতের যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করুন । লক্ষ লক্ষ তরুন - তরুনী যৌবন হারিয়ে অশীতিবর্ষে পদার্পন করেছে আর নিজেদেরকে অসহায় ভেবে সামান্য শিশুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । বিংশতি বর্ষের নবযৌবনের উন্মাদনা তাদের শরীরে আবার ফিরিয়ে দিন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করুন । নির্যাতিত নারী জাতির বুকে মায়া ফিরিয়ে একবার তাদের শক্তিশালী পুরুষে রুপান্তরিত করুন । আর পুরুষের বুকে দুধ দিয়ে ও পেটে ছেলে জন্মাবার ব্যাবস্থা করে আপনার সৃষ্টি কৌশল পদ্ধতি দেখিয়ে দিন । বৃক্ষরাজি সৃষ্টির পর থেকে একই প্রকার ফল দান করতে করতে নতুনত্বের ব্যাঘাত করেছে । এবারে আপনি আম গাছে জাম, কলা গাছে মূলা, পেয়ারা গাছে নারকেল, বেল গাছে তাল আর সুপারী গাছে তরমুজ ফলানোর ব্যাবস্থা করে আমাদের রুচির পরিবর্তন করুন । লবনে চিনির মিষ্টি, দুধে দইয়ের স্বাদ, আর ঘোলকে খেরসাপাত করে আপনার রসায়ন বিজ্ঞানের কারিগরী দেখান । সাপের বিষকে অমৃত, শিঙ্কোনার রসকে মধু আর সাগরের লোনাজলকে সুপেয় করবার ব্যাবস্থা করে আপনার ক্ষমতার বিকাশ করুন । হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে, স্বাস - প্রশ্বাসের দ্বার রুদ্ধ করে আপনার সৃষ্ট - পদ্ধতি অনুযায়ী জীবকে বাঁচিয়ে রাখুন ও রক্ষাকারী বলে নিজেকে প্রমাণ করুন । মনের সম্মুখে বাঁধ দিয়ে দেহ অভ্যন্তরের শুক্রকীট ধ্বংস করে নারীর সাথে পুরুষের মিলনের পুলক এনে দিন । পারবেন ? এর একটাও কি করতে পারবেন ? যদি বলেন - না, তাহলে আমি শুনব না । কেননা একচ্ছত্র অধিনায়ক সবই করতে পারে । আল্লাহ নেই, শাসক নেই, বাধা দেবার লোক নেই, তাহলে পারবেন না কেন ? যদি না পরেন, তাহলে বলব আপনি ভীরু, ভন্ড ও ক্ষমতাহীন । যদি ভীরু হন তবে কেন নির্ভিকের কাছে মাথা নত করেননি ? যদি ভন্ড হন তবে কেন প্রকৃত সৃষ্টকর্তার কাছে ক্ষমা চাননি ? আর যদি ক্ষমতাহীন হন তবে কেন ক্ষমতাশালী বিশ্বনিয়ন্তার কাছে নিজেকে সঁপে দেননি ? যদি আপনি কিছুই না পারেন তবে কেন স্বীকার করেননি যে এ বিশ্বের একজন সর্বাধিনায়ক আছেন যদি

মহাবিধানুবলেই সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যিনি আল্লাহ, যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা - যাঁর অস্তিত্ব আছে।

আস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্বের বহু প্রমাণ নিজেদের মধ্যে খুঁজে পায়, কিন্তু নাস্তিকরা আল্লাহ নেই এ কথা ছাড়া আর কোন প্রমাণই উত্থাপিত করতে পারে না। তাই নাস্তিক্যবাদীদের প্রত্যক্ষবাদী বা সুক্ষ্মবাদী বলা চলে না। তাদেরকে অবৈজ্ঞানিক ও ভন্ড বললে প্রত্যুক্তি হয় না, কেননা বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণেই বিশ্বাসী। যাদের বিশ্বাস নেই তাদের 'থিওরী' নেই। যাদের থিওরী নেই তাদের প্রমাণ নেই। যাদের প্রমাণ নেই তারাই ভন্ড ও প্রতারক।" (বিজ্ঞান না কোরআন, পৃষ্ঠা - ১৭২/১৭৭)

বৈজ্ঞানিকরা কেন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন ?

Mr. A. Creessy Morrison, নিউইয়ার্ক একাডেমী অব সাইনসেস এর সাবেক সভাপতি ১৯৪৮ জানুয়ারীর ''রিডার্স জাইজেষ্টে'' ও পরবর্তীতে ১৯৬০ নভেম্বরের ''রিডার্স ডাইজেষ্ট'' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিদ্যার প্রফেসার C.A. Coulson, FRS এর সুপারিশে প্রকাশিত হয় একটি নিবন্ধ নাম ঃ Seven reasons Why a scientist believes in God অর্থাৎ সাতটি কারন ঃ কেন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন। এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের কারণ হিসাবে সাতটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ঃ

প্রথম যুক্তি ঃ গণিত শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে মহাবিশ্ব একজন বড় ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানবান শক্তির দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত। মনে করা যাক দশটি মুদ্রায় এক থেকে দশ চিহ্ন দেওয়া হলো। এগুলোকে যদি ঝাকুনি দিয়ে আমরা এর সিরিয়ালি হিসাব পেতে চাই তাহলে সে সুযোগ মিলিয়ন মিলিয়ন বার ঝাকুনি দিলেও পাওয়া কঠিন। একইভাবে পৃথিবীতে জীবনের জন্য যে সব সঠিক পরিস্থিতি প্রয়োজন তা শুধু 'চান্স' (সুযোগ বা দুর্ঘটনা) এর মাধ্যমে লাভ করা অসম্ভবপর। পৃথিবী এর নিজস্ব অক্ষে ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে ঘুরে, যদি পৃথিবী একশত মাইল বেগে ঘুরত, তাহলে আমাদের দিন ও রাত দশগুন বেড়ে যেত বর্তমানের চেয়ে, আর উত্তপ্ত সূর্য বৃহত্তর দিনে আমাদের ফসল, উদ্ভিদ পুড়িয়ে ফেলত। আর দীর্ঘ রাতে উদ্ভিদের কচি চেহরা নষ্ট করে ফেলত।

সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা হলো বারো হাজার ফারেনহাইট। আমাদের পৃথিবী যে দূরত্বে রয়েছে তাতে না বেশী, না কম তাপমাত্রা তা গ্রহণ করছে। সূর্য যদি এর বিকিরণ অর্ধেক কমাত, তাহলে আমরা জমে যেতাম; আর যদি বিকিরণ আরও অর্ধেক বাড়াত আমরা হয়ে পড়তাম কাবাব।

পৃথিবী ২৩ ডিগ্রি কাত হয়ে থাকায়, আমরা পৃথিবীতে নানা ঋতু পাচ্ছি। যদি এ ভাবে পৃথিবী বাঁকা না হয়ে থাকত, মহাসমুদ্রের বাষ্পকণা উত্তর ও দক্ষিনে উড়ে যেত, আর আমাদের বাসভূমির এ এলাকা হয়ে যেত মরফের মহাদেশ। যদি চাঁদও বর্তমান অবস্থানে না থেকে পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে থাকত, তাহলে দিনে দু'বার সমুদ্রে এমন জোয়ার আসত যে মহাদেশসমূহ পানিতে ডুবে যেত। এমনকি পাহাড়সমূহ ভেসে যেত। যদি পৃথিবী মৃন্ময় উপরিভাগ (Crust) মাত্র দশ ফিট ঘন হতো, তাহলে কোন অক্সিজেন গ্যাস থাকত না, ফলে কোন জীবও বাঁচত না। মহাসমুদ্র যদি আরও কম ঘন হতো তাহলে যে লক্ষ - লক্ষ উল্কা বর্তমানে শূন্যে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে, সে সব পৃথিবীর সর্বত্র এসে আঘাত হানত ও অগ্নিকান্ড ঘটাত।

এসব কারণ ও আরো অন্যান্য উদাহরণের জন্য বলতে হয় যে লক্ষের ভিতর একটি 'চান্স' (সুযোগ) নেই যে বলা যাবে যে এই পৃথিবীতে জীবন শুধু মাত্র একটি দুর্ঘটনা।

দ্বিতীয় যুক্তি ঃ উদ্দেশ্য সাধন করতে জীবনের ভিতর যে সম্ভাবনা রয়েছে তাই প্রমাণ করে যে এর পিছনে একজন বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা রয়েছে।

জীবন কি তা মানুষ কমই বুঝতে সক্ষম। এর নেই ওজন, নেই আকার। অন্যদিকে বর্ধিত বৃক্ষ শেকড় পাথরকে কেটে ফেলে। জীবন এমন এক শিল্পি যে গাছের প্রতিটি পাতাকে আর্ট করে, রঙিন করে। জীবন পাখির কণ্ঠে কি সুন্দর গান সৃষ্টি করে। জীবন ফলে মিষ্টতা, ফুলে সুগন্ধী, গাছে কার্বনিক এসিড প্রবেশ করার ও গাছ থেকে অক্সিজেন নির্গত করে জীব-জন্তুর জন্য।

প্রায় অদৃশ্য প্রটোজমের ফোঁটা, যা স্বচ্ছ ও জেলির মত ও চলৎশক্তিসম্পন্ন, সূর্য থেকে শক্তি টেনে নেয়। এই স্বচ্ছ ও কুয়াশার মত একক সেল সম্পন্ন ফোঁটা ধরে রাখে জীবন। কে এসব সম্পন্ন করেছেন ?

তৃতীয় যুক্তি ঃ জীব জন্তুর বৃদ্ধি প্রকাশ করে যে এইসব অসহায় সৃষ্টির ভিতরে দয়ালু স্রষ্টা স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাব (Instinct) সৃষ্টি করে দিয়েছেন ।

অল্প বয়সী স্যামন মাছ বছরের পর বছর সমুদ্রে বাস করে, তারপর সে নদীর সেই অংশে আসে যাতে অন্য একটি উপনদী পতিত হয়েছে এবং সে এই স্থানটিতে জন্মেছিল । কে তাকে এই পথে সেই জন্মস্থানে নিয়ে এল ? তুমি যদি তাকে অন্য কোন উপনদীর সঙ্গমস্থলে রেখে আস, সেই স্যামন মাছটি বুঝতে সক্ষম হবে যে সে তার জন্মস্থানে নেই, ভুল জায়গাতে এসে পড়েছে । সেই আবার মূলনদী দিয়ে তার প্রকৃত জন্মস্থানের উপনদীতে এসে হাজির হবে ।

বান (ঈগল) মাছের ব্যাপার আরও আশ্চর্যজনক । এই বান মাছগুলো বয়ঃপ্রপ্ত হলে নদী নালা থেকে হিজরত (পলায়ন) করে । ইউরোপের মানমাছ হাজার হাজার মাইল দুরে বারমুডার সমুদ্র অঞ্চলে চলে যায় । সেখানে তারা বংশ বিস্তার করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় । বানের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো পানি ছাড়া কিছুই দেখে নাই । তারা যত্রা শুরু করে সেই ঠিক জায়গাতে সেখানে তাদের পিতা মাতা একসময় বসবাস করত । এমনকি শুধু সেই এলাকা নয়, সেই নদী বা সেই হ্রদে পৌঁছে যায়, যেখানে তাদের বাবা - মায়েরা থাকত । ফলে সর্বত্র বান মাছে ভর্তি হয়ে যায় । আমেররিকার বান ইউরোপে যায় না । আর ইউরোপের বান আমেরিকায় যায় না । বারমুডার সমুদ্র অঞ্চল থেকে ইউরোপের দুরত্ব আমেরিকার চাইতে বেশী বলে ইউরোপের বান মাছের বয়ঃপ্রাপ্ত হতে একবছর বা তার চেয়ে বেশী সময় বরাদ্দ করেছে প্রকৃতি । কোথায় থেকে এই নির্দেশকারী তাড়না (Impulse) এল ?

এক বোলতার কান্ডকারখানা দেখ । একটা বোলতা একটা ফড়িং পাকড়াও করল, তার পারে সে মাটিতে একটি গর্ত করে, তারপর ফড়িং এর এমন জায়গায় শুঁড় ফুঠে দেয় যাতে সে শুধু অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু মরে না যেন । উদ্দেশ্য ফড়িং কে রক্ষিত মাংস হিসাবে বাঁচিয়ে রাখা, কিন্তু ফড়িং যেন পালাতা না পারে । এরপর বোলতা অজ্ঞান ফড়িং এর পাশে ডিম পাড়ে । ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো অজ্ঞন ফড়িং এর শরীর থেকে ঠোকর মেরে মেরে খাদ্য গ্রহণ করে । তাদের জন্য মৃত, পচা মাংস বিষবৎ হবে, তাই তাজা মাংস সরবরাহে এ ব্যাবস্থা । এরপর মা বোলতা উড়ে চলে যায় ও মারা যায় । সে কোন সময় তার বাচ্চাদের দেখে না । বোলতারা সবসময় একাজ করে যাচ্ছে, প্রথমবার এবং সববার, নইলে পৃথিবীতে বোলতা বলে কিছু পাওয়া যেত না । বোলতার এই যে আশ্চর্যজনক ব্যাবহার তা

বিবর্তন বা খাপ খাওয়ানো পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না । এই ব্যাবস্থার এই ক্ষুদ্র বোলতার জন্য নিয়ামত বিশেষ ।

চতুর্থ যুক্তি ঃ জন্তু জানোয়ারের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাব (Instinct) এর চেয়ে বেশী রয়েছে মানুষের জন্য তা হলো চিন্তাশক্তি (Power of reason) ।

অন্য কোন জন্তুর দশ পর্যন্ত গোনার যোগ্যতা নেই, এমন কি তারা দশের অর্থ বুঝতে সক্ষম নয় । স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাব (Instinct) যদি বাঁশির একটি সুর হয়, তবে মানুষের মগজের রয়েছে বহু সুর সৃষ্টির ক্ষমতা । মানুষের চিন্তাশক্তি বিস্ময়কর ।

পঞ্চম যুক্তি ঃ জিনস (Jenes এর জন্ম বা উৎপত্তি বিষয়ক উপাদান) এর বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমরা এখান জানতে পেরেছি । এ জ্ঞান ডারউইনের সময় ছিল না । এই 'জিনস' এত ক্ষুদ্র যে সমগ্র পৃথিবীর সব মানুষের এ সংক্রান্ত উপাদান একটি মাত্র অঙ্গুস্তানার (সেলাইয়ের জন্য আঙ্গুলের টোপর) উপর নিলেও জায়গা খালি থাকবে । জিনস এত ক্ষুদ্র তবু এই অতিক্ষুদ্র উপাদান ও তার সাথী 'ক্রোমোজম' প্রতিটি জীবন্ত সেলে বসবাস করে । মানুষ, জন্তু জানোয়ার ও উদ্ভিদের বৈশিষ্টের চাবিকাঠি 'জিনস' কিভাবে সমগ্র বংশধরের বৈশিষ্টসমূহ ও প্রত্যেক জীবনের পৃথক বৈশিষ্টসমূহ এত ক্ষুদ্র পরিসরে রক্ষণ করে ? কয়েক মিলিয়ন পরমাণু ক্ষুদ্রমত জিনসে বন্দী হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে যে যাদুকরী কার্য করে তা শুধু একটি সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার কাছ থেকেই হতে পারে ।

ষষ্ঠ যুক্তি ঃ প্রকৃতিতে যে মিতব্যয়িতা, পরিমিত ও পরিচলন প্রক্রিয়া রয়েছে তা দেখে আমরা বলতে বাধ্য যে একমাত্র একটি অসীম জ্ঞানবান সত্তাই এমন ব্যবস্থার স্রষ্টা হতে পারেন ।

বহু বছর পূর্বে একধরণের মনসা জাতীয় গাছ (ক্যাকটাস) অস্ট্রেলিয়াতে লাগানো হয় বেড়া হিসাবে । তা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে ইংলন্ডের সমান এক এলাকায় ছড়িয়ে গেল, শহর, গ্রাম, কৃষিফার্ম মনসা গাছে উজাড় হতে লাগল । অবশেষে কীটতত্ত্ব বিদগণ এমন এক জাতীয় কীট অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এলেন যা শুধু মনসা গাছ খেয়ে বেঁচে থাকে । দেখতে দেখতে মনসা গাছের বিপদ কেটে গেল । মনসা গাছ এখন আয়ত্বে এসে গেল ।

প্রকৃতিতে এই ক্ষমতা, সামঞ্জস্যতা দেওয়া হয়েছে । এই যে জলদি বিস্তার প্রাপ্ত কীট পতঙ্গ তা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গিলে খাচ্ছে না কেন ? কীট পতঙ্গের ফুসফুস নেই, তারা টিউবের মাধ্যমে নিঃশ্বাস নেয় । যখন এসব কীট পতঙ্গ বড় হয়, তাদের টিউব তেমন বাড়ে না । তাই কীট পতঙ্গ সমূহ বিরাট আকার ধারণ করে না । তাদের আকার তাই তাকে ক্ষুদ্র । শরীরের এই বাড়ন্ত যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকত তাহলে প্রকৃতিতে একটা ভীমরুল সিংহের মতো বড় হতো । আর তাতে কি যে বিপদ চারিদিকে দেখা যেত ।

সপ্তম যুক্তি ঃ মানুষ যে স্রষ্টায় ধারণা করে তাই স্রষ্টার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ । কল্পনা শক্তির সাহায্যে মানুষ স্রষ্টার ধারণা পায় । কল্পনার দ্বারাই মানুষ অদেখা জিনিসের প্রমাণ করে । মানুষ সর্বত্র স্রষ্টার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে । সর্বত্র স্রষ্টার 'ডিজাইন' (নকসা) ও উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করে মানুষ । স্রষ্টার কর্মের ছাপ সর্বত্র । আর মানুষের অন্তকরণে ও স্রষ্টার অবস্থিতি অনুভব যোগ্য । সমগ্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার প্রশংসা, আর সর্বত্রই তাঁর কুদরতী হাতের ছোঁওয়া ।

এছাড়াও সৃষ্টি বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায় । যেমন,

প্রজাপতির দেহে বেতার তরঙ্গ ঃ বেতার যন্ত্র বিজ্ঞানের এক বিস্ময়ক আবিস্কার । মানুষ বেতার তরঙ্গ কোন জায়গায় পাঠাতে যন্ত্রের ব্যাবহার করে কিন্তু একটি প্রজাপতি কোনরকম যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই অন্য প্রজাপতির কাছে পাঠাতে সক্ষম । আমরা মানুষ হয়েও যন্ত্র ছাড়া বার্ত অন্য কোন মানুষের কাছে পাঠাতে পারিনা । বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রজাপতির কাছে পরাজয় স্বীকার করি । একটা প্রজাপতিকে যেকোন ভাবেই একটি কাঁচের ঘরে আবদ্ধ করে রেখে দিলেও সে তার সংকেতধ্বনি অন্য প্রজাপতির নিকট পাঠাতে সক্ষম । আবার যে প্রজাপতির কাছে বার্তা পাঠানো হয় সেই প্রজাপতিও তার বার্তার জবাব দিতে সক্ষম । সে পৃথবীর যে কোন প্রান্তেই থাকুক না কেন এবং তাকে কঠিন কাঁচের ঘরে আবদ্ধ করে রাখুক না কেন । আমরা এই কয়েকশত বছরদ আগে বেতার যন্ত্র আবিস্কার করে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছি তবুও প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির সময় বা বেতার ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে গন্ডগোল হলে বেতার যন্ত্র অকর্মন্য হয়ে পরে কিংবা কোন বেতার যন্ত্রকে কাঁচের ঘরে রেখে দিলে আর কাজ করে না কিন্তু প্রজাপতি বিন যন্ত্রে তা পারে ।

প্রজাপতির দেহে এই সংকেতধ্বনি পাঠাবার কৌশল সৃষ্ট করল কে ? যে বেতার যন্ত্রের উপর মানুষ পড়াশুনা করেও, গভীর অধ্যাবসায় করে বেতার যন্ত্র মেরামতির উপর ট্রেনিং নিয়েও মানুষ তা সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনতে পারে না অথচ একটি নিরীহ প্রজাপতি কোন রকম ট্রেনিং না নিয়েও, পড়াশুনা না করেও, কোন রকম সাধনা না করেও তার শরীরের মধ্যে বেতার যন্ত্রকে আয়ত্বে আনল কি করে ? এর ব্যাখ্যা কোন নাস্তিক দিতে পারবেন না । একমাত্র মহান আল্লাহ তা'লাই এসবের ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন ।

কোকনছ পাখি ঃ কোকনছ নামে একপ্রকার পাখি আছে । এই পাখির কোন জোড়া নেই বা এদের মধ্যে স্ত্রী জাতীয় পাখি নেই । এই পাখিগুলি এক হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে । এই পাখিদের সংখ্যা খুবই কম কেননা মরার পর এরা ডিম পাড়ে ও সেই ডিম থেকে বাচ্চা জন্ম হয় । কি আশ্চর্য্য ! মরার পর এরা ডিম পাড়ে । শুনতে আশ্চর্য্যজনক হলেও তা সত্যি যে এরা মরার পর ডিম পাড়ে । কিভাবে এরা মরার পর ডিম পাড়ে শুনুন ঃ

যখন কোন কোকনছ পাখি জানতে পারে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে আসছে তখন তারা নিজেদের বংশগতি বজায় রাখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে । তাই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে একটি সুন্দর কাঠের চুলো তৈরী করে । তারপর সেই চুলোর মধ্যেখানে বসে যায় এবং সেখানে বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও রাগিনীতে গান গাইতে থাকে । এই পাখির ঠোঁটটি অদ্ভুত ধরণের এবং সেই ঠোঁটে অসংখ্য ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রের ভিতর থেকে পিয়ানোর মতো এক প্রকার সুর বের হতে থাকে । এইভাবে গান করতে করতে যখন ঠোঁটের একটি ছিদ্র থেকে অগ্নিরাগিনী সুর বের হয় তখন তার পাশের কাঠগুনিতে আগুন লেগে যায় এবং সেই কোকনছ পাখি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় । তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি হবার পর এই ছাই থেকেই অলৌকিকভাবে এক ডিমের সৃষ্টি হয় । এরপর নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সেই ডিম থেকে বাচ্চার সৃষ্টি হয় ।

এছাড়াও বহু বৈচিত্র রয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মধ্যে । ঝিঁঝিঁ পোকার দিকে লক্ষ্য করুন । একটা ঝিঁঝিঁ পোকা আঠারো দিন পর্যন্ত তার সংকেত ধ্বনি দেয় এবং প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তার সংকেত চলতে থাকে । ঘড়ি ধরে ঝিঁঝিঁ পোকার এই সংকেত ধ্বনি শুনলেই বুঝতে পারা যাবে এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক সেকেন্ডও কম বেশী হবে না । এই নিঁখুত সময়জ্ঞান তার মধ্যে কোন অদৃশ্য সত্ত্বা সৃষ্টি করে দিল

কবুতর, পেচক পাখি প্রতি প্রহরে মনুষকে জাগিয়ে তোলে তাদের মধ্যে এই সময়ের জ্ঞান কোন অদৃশ্য সত্ত্বা সৃষ্টি করে দিল ?

বাদুড় পাখির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাদুড় পাখি সবসময় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে । এরা যখন সন্তান প্রসব করে তখনও ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে । এরা মুখে সন্তান প্রসব করে । কারণ শূণ্যের দিকে একমত্র গ্যাস ছাড়া কোন জিনিস যাওয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম বহির্ভূত ।

বাদুড় পাখি যখন প্রসব যন্ত্রনায় অস্থির হয় তখন সে তার সঙ্গী-সাথীদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করে । তখন কোন বাদুড় সান্তনা দেয়, কেউ এসে উচ্চস্বরে চিৎকার করে আল্লাহকে আহ্বান করে । আর পুরুষ বাদুড়টির স্ত্রীর এই বিপদের সময় স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার প্রসস্ত ডানার ভিতরেই স্ত্রী বাদুড়টি সন্তান প্রসব করে ।

সৃষ্টির কি অপরূপ বৈচিত্র ! এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় একজন স্রষ্টা এই সৃষ্টির অন্তরালে বিরাজ করছেন । প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তত্ব অনুভব করতে পারেন ।

চার্লস ডারউইনের ভ্রান্ত মতবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চালর্স ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদের মতবাদ পেশ করেন এবং তিনি দাবী করেন যে মানুষের পূর্ব পুরুষ ছিল বাঁদর বা শিম্পাঞ্জী, বিবর্তননের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মানুষে পরিনত হয়েছে । ডারউইন যে মতবাদ খাড়া করেছেন তার ভিত্তি হল সফরের পর্যবেক্ষন । তিনি দাবী করেন, তাঁর সফরকালীন সময়ে বনজঙ্গল ও সমুদ্রে তিনি যেসব পর্যবেক্ষণ করেন সেসব থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন নতুন বিষয় লক্ষ্য করেন । তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি জন্তু স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবেই বিবর্তিত ও উন্নীত হয়েছে । বস্তু ও প্রাণী সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে তার প্রকৃতি আপনাআপনিই বদলে ফেলেছে । জলে স্থলে, সমুদ্র ও জঙ্গলে যেসব বড় বড় প্রাণী আজকাল দেখতে পাওয়া যায় সেসব আগে ছিল অন্যরকম । বুকে ভর করে চলা প্রাণী হাজার হাজার বছরে চতুস্পদ প্রাণীতে উন্নীত হয় । আবার চতুস্পদ প্রাণী দ্বিপায়ী প্রাণীতে উন্নীত হয় এর বহু বছর পর । এর আগে জলজ প্রাণী স্থলে আসলে বিবর্তনের মাধ্যমে তার আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় । এটাই ছিল ডারউইনের মতবাদ ।

কিন্তু ডারউইন যে মতবাদ খাড়া করেছিলেন তার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল না । আন্দাজের উপর ভিত্তি করে তাঁর মতবাদ খাড়া করেছিলেন । তিনি বস্তুর প্রকৃতি, এর রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সচল প্রানীর প্রক্রিয়া, এদের উপাদান সমুহের বিন্যাস, এদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদী বিষয়ে গভীর পরীক্ষা নীরিক্ষা করেননি । কেবলমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাঁর মতবাদ খাড়া করেছিলেন । ফলে বিংশ শতাব্দীর সুচনালগ্নেই তাঁর ভ্রান্ত মতবাদ মুখ থুবড়ে পড়ে ।

একসময় নাস্তিক্যবাদীরা যখন জগৎ সৃষ্টির রহস্য নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছিলেন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কোন মনপুত থিওরী পেশ করতে পারছিলেন না তখন চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতবাদ তাঁদের প্রাণে নতুনভাবে চেতনার সঞ্চার হল । ফলে তাঁরা ডারউইনের এই মতবাদ আর দেরী না করে লুফে নিলেন । কিন্তু তাঁদের এই উৎফুল্লতা মোটেই শোভনীয় নয় কারণ চার্লস ডারউইন নিজে সৃষ্টিকার্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । (দেখুন অরিজিন অফ স্পেসিস, চার্লস ডারউইন, পৃষ্ঠা-৪৫০)

ডারউইন তাঁর গবেষনা শুরু করেন সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । তাঁর জন্ম হয় ১৮০৯ সালে । তার এই ৭১ বছরের জীবনে মাত্র একবার লন্ডনের বাইরে যান । সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর । তিনি দক্ষিন আমেরিকা ও এর উপকুল অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপসমূহে ভ্রমণকালে তিনি মানুষের গঠন ও কাঠামোর সঙ্গে বনমানুষ, বাঁদর ও দ্বীপপুঞ্জে এমনসব প্রাণী দেখেছিলেন যেসব তিনি এর আগে কখনোই দেখেননি । তিনি সফরকালীন সময়ে যা কিছু দেখেন, বলা হয় তাতে জীবনের বৈচিত্র সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা বদলে দেয় ।

মজার কথা হল, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে তিনি আর কখনো সারা জীবনে আর সফরে যাননি । একবার সফর করেই তিনি বিশ্ব-বৈচিত্রে রহস্য বুঝে ফেললেন এবং এই বোঝার ফলে তাঁর বাড়ির একটি কুঠুরীতে সফরের পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে তাঁর থিওরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা জীবন অতিবাহিত করেন । অথচ আল বিরুনী, ইবন বতুতা, ফা হিয়েন সারা পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেও এমন কোন প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র ও বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করে একটাকে অপরটির পূর্ব পুরুষ বলে দাবী করলেন না পক্ষান্তরে ডারউইন সাহেব একটি চোর কুঠুরীতে বসে মানবসৃষ্টির রহস্য অনায়াসে বলে দিতে পারলেন । যদিও তৎকালীন যুগে বিজ্ঞান এতো উন্নত ছিল না যে একটি চোর-কুঠুরীতে বসে বসে হাজারো পর্দার অভ্যন্তরে নিরীক্ষণ করতে পারেন অর্থাৎ শতাব্দী-শতাব্দীর অগ্র পশ্চাতের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন । একটা অপরিচিত

মহাদেশের ছোট অংশ এবং তার আশেপাশের কিছু দ্বীপ ভ্রমণকারী একজন ব্যাক্তি এ দাবী করেন যে, তিনি পৃথিবীর বৈচিত্র এবং বিশ্বভূখন্ডে বিরাজমান প্রাণীদের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সবকিছু জেনে গেছেন তাহলে তাকে চরমতম উন্মাদ বা পাগলই বলতে হবে । কিন্তু নাস্তিক্যবাদীরা যাঁরা ডারউইনের থেকেও বড় পাগল তাঁরা কোন বিরোধীতা না করেই এই থিওরীকে লুফে নিলেন ।

সমালোচনা

ডারউইন এবং তাঁর অনুসারীরা যে পর্যবেক্ষণের কথা বলেন তা হল সবথেকে বড় ধোকা । এই ধোকাবাজীর মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে তারা বোকা বানিয়ে রেখেছে বহুকাল ধরে । কেননা, এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাণীর মৌলিতায় কখনো কোন পরিবর্তন আসেনি । ঝিঁঝিঁ পোকা হাজার বছর আগেও ঝিঁঝিঁ পোকা ছিল । টিকটিকির চেহরা হাজার বছর আগেও আজকের টিকটিকির মতোই ছিল । তাদের দেহের মধ্যে সামান্যতমও পরিবর্তন হয়নি । উদ্ভিদ-গাছ, প্রাণী, মানুষ হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ বছরের অবসরেও তাদের মৌলিকতায় কোন পরিবর্তন হয়নি, যেমন ছিল ঠি তেমনই থেকে গেছে । কখনো এমন হয়নি যে একটি প্রাণী উন্নীত হয়ে অন্য প্রাণীতে পরিণত হয়েছে ।

জীবাশ্ম বিজ্ঞান ও ডারউইনের মতবাদ ঃ জীবাশ্ম আবিস্কার হওয়ার পর ডারউইনপন্থীরা আশা করেছিলেন যে এর মাধ্যমে তাঁদের মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হবে । কিন্তু জীবাশ্ম বিজ্ঞানের উপর গবেষনা করার পর উল্টো ডারউইনের মতবাদ আরও বেশী মৃত্যুমুখে পতিত হল । গবেষনার ফলাফল গেল ডারউইন মতবাদের বিরুদ্ধেই । দৃষ্টান্তস্বরুপ একটি ব্যাঙকে ধরা যাক । ২৫০ মিলিয়ন বছর আগের পুরোন জীবাশ্ম প্রমাণ করেছে যে তখনকার ব্যাঙের আকৃতি এবং বর্তমান ব্যাঙের আকৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । এখনকার ব্যাঙ ও তখনকার ব্যাঙের মধ্যে কোন ফারাক পরিলক্ষিত হয়নি ।

১৫০ বছর অথবা তার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন মৃত্তিকা গর্ভে প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে মাছ সব সময় মাছই ছিল । পোকা-মাকড় সবসময় পোকামাকড়ই ছিল । পাখি সর্বদাই পাখিই ছিল । বুকে ভর করে চলা প্রাণী বুকে ভর করে চলে আসছে অনন্ত কাল থেকেই । কিন্তু এমন একটি জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করতে সক্ষম হননি যে, সেই জীবাশ্ম দ্বারা প্রমাণ হয় বা সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রাণীর শরীরে কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন এসেছে । এমন প্রমাণ

পাওয়া যায়নি যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে বুকে হাঁটা প্রাণী পাখিতে পরিণত হয়েছে বা কোন বানরে পরিণত হয়ে ক্রমে বনমানুষ থেকে মানুষে রুপান্তরিত হয়েছে ।

সুতরাং চার্লস ডারউইনের চিন্তাধারা এক অদ্ভুত ও অমূলক চিন্তাধারা । যার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই । তাঁর মতবাদ এতই নিকৃষ্ট পর্যায়ের যে শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষের মতো সভ্য প্রাণীকে বানরের কাতারে সামিল করেছেন । ডারউইন সাহেব দেখেছেন যে মানুষকে দেখতে কিছুটা বানরের মতো তাই মানুষ বানরের পূর্বপুরুষ ।

কি অদ্ভুত কল্পনা ! কি অমূলক ও ভ্রান্ত তাঁর থিওরী ! তিনি আমাদের পূর্বপুরুষকেও চিনতে পারলেন না । তিনি মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও নিরুপন করতে পারলেন না । মানুষের আকৃতির সঙ্গে বানরের আকৃতির সামান্য মিল থাকলেও কোনক্রমেই বলা যায় না যে বানর মানুষের পূর্বপুরুষ । মানুষের সাথে বানরের দৈহিক ও অস্থিমজ্জার সাদৃশ্যের জন্য একথা প্রমাণ হয় না যে তারা একটাই প্রজাতির প্রাণী । কেননা, অনেক প্রাণীই এমন আছে যাদের প্রকৃতভাবে স্বভাব, বুদ্ধি ও আকৃতি একই রকমের । যেমন, কড মাছ ও হেডক মাছ একই রকমের সামুদ্রিক মাছ, তারা একই রকমের মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং একই রকমের শরীরের অধিকারী ।

তবুও কেউ বলে না যে তারা একটি অপরটার পূর্বপুরুষ । বাবুই পাখি ও চড়ুই পাখির আকৃতি একই রকমের । তাদের অস্থি মজ্জা কেটে পরীক্ষা করলে তাহলে কোন পার্থক্যই পাওয়া যাবে না । তাদের স্বভাব ও কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে পার্থক্য নিরুপন করা হয় । কোন বাবুই পাখির বাচ্চাকে যদি চড়ুই পাখির ঝাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বাবুই পাখি কখনো চড়ুই পাখিকে অনুকরণ করে না । সৃষ্টির আদি কাল থেকেই তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । তবুও কেউ বলে না যে একটি অপরটির পূর্বপুরুষ ।

এই বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে অনেক প্রাণী এমন আছে যারা দেখতে একটি অপরটির মতো । যেমন, এলিগেটর ও কুমির দেখতে একই আকৃতির, পাবতা মাছ ও বোয়াল মাছ একই রকমের, শোল মাছ ও টাকি মাছ, কবুতর ও ঘুঘু পাখি, টিকটিকি ও গুইসাপ প্রভৃতি দেখতে একই রকমের । এদের সাদৃশ্যের মধ্যে কোন বিশেষ কোন ফারাক নেই । তাহলে ডারউইন পন্থীরা কি বলবেন যে বোয়াল মাছ পাবতা মাছের পূর্ব পুরুষ, এলিগেটর কুমিরের পূর্বপুরুষ,

শোল মাছ টাকি মাছের পূর্ব পুরুষ, কবুতর ঘুঘু পাখির পুর্বপুরুষ, টিকটিকি গুইসাপের পূর্বপুরুষ ?

এরকম ধরণের কথা তো রাঁচীর পাগলা গারদের কোন উন্মাদ-পাগলেরাও বলে না । কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর পাগলের সর্দার চার্লস ডারউইন তা বলেছেন । আর নাস্তিক্যবাদীরা তা বিনাবাক্য প্রয়োগে একলাফে লুফে নিলেন । তাদের মনে এই প্রশ্নটুকুও জাগল না এলিগেটর ও কুমিরের মধ্যে, পাবতা মাছ ও বোয়াল মাছের মধে, শোল মাছ ও টাকি মাছের মধ্যে, টিকটিকি ও গুইসাপের মধ্যে যতটুকু সাদৃশ্য আছে তার থেকে অনেক বেশী বৈসাদৃশ্য বানর ও মানুষের মধ্যে রয়েছে । বানর একধরণের কুশ্রী, কদাকার, খর্ব প্রকৃতির প্রাণী । তাই তাদের পূর্বপুরুষ আরও কুশ্রী ও কদাকার হওয়াটাই স্বাভাবিক । তাই এই কুশ্রী কদাকার প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এতো উন্নত, সুন্দর, সুস্থ, লম্বাকৃতি মানুষে পরিণত হওয়া নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদের বিরোধী ।

মানুষের পূর্বপুরুষ যে বানর ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে । মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি সচল ও সক্ষম । খাদ্যগ্রহণ থেকে শুরু করে দুনিয়ার যাবতীয় কঠি কাজ এই বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় । পক্ষান্তরে বানরের বৃদ্ধাঙ্গুলি অচল এবং অকর্মন্য । বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অচল অকর্মন্য অথবা লয়প্রাপ্ত বস্তু থেকে সচল, সক্ষম এবং বর্ধিষ্ণু বস্তুতে পরিণত হতে পারে না । মানুষের আকৃতি লয় পেতে পেতে বানরের আকৃতিতে পরিনত হওয়া হয়তো সম্ভব হতে পারে কিন্তু কদাকার বানর হতে মানুষে পরিণত হতে পারে না ।

জীববিজ্ঞানে ব্যাবহার অব্যাবহারের সূত্রে বলা হয়েছে যে, "যদি কোন অঙ্গ দীর্ঘদীন অব্যবহার করা হয় তাহলে তা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে । অপরদিকে অঙ্গকে ব্যবহারের ফলে সুঠাম ও সবল হয় ।" যদি এই সূত্রকে আমরা বিবর্তনবাদের উপর প্রয়োগ করি তাহলে চার্লস ডারউইনের মতবাদের বালুকাপ্রাসাদ ক্ষণিকের মধ্যে ধুলিস্যাত হয়ে যায় ।

বানরের বৃদ্ধাঙ্গুলি অচল ও অক্ষম । পক্ষান্তরে মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি সচল ও সক্ষম । তাহলে বানর কিভাবে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘদিন নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যাবহার করে সক্ষম ও সবল করে ফেলল যার দ্বারা পরবর্তীকালে সে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষে পরিণত হয়ে গেল ? ব্যবহার অব্যবহারের সূত্র যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া

তাহলে এর উত্তর বস্তুবাদী নাস্তিকদের দিতেই হবে । যারা ডুমন্ত মানুষের খড়কুটোর আশ্রয়ের মতো ডারউইনের মতবাদকে আঁকড়ে ধরে আছেন ।

ব্যবহার অব্যবহারের সূত্র অনুযায়ী মানুষ দীর্ঘদীন নিজের আঙ্গুল অব্যবহারের জন্য অক্ষম হতে পারে কিন্তু যা একেবারেই অক্ষম যা কোনদিন ব্যাবহার করা হয়নি তা সক্ষম কোনদিনই হতে পারে না ।

সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতবাদ একবিংশ শতাব্দীর একটি পচা মতবাদ । যার সঙ্গে সত্যতার কোন সম্পর্ক নেই ।

বিগ ব্যাং থিওরী

বিগ ব্যাং থিওরী আবিস্কারের ফলে আল্লাহর অস্তিত্ব থাকা একটা চুড়ান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং নাস্তিক্যবাদীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ে । বিগ ব্যাং থিওরী বর্তমানে বিজ্ঞানের চুড়ান্ত সত্য আবিস্কার । এই আবিস্কারের ফলে ১৯৭৩ সালে জোড়া বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ।

এই বিগ ব্যাং থিওরীর আবিস্কার করেছিলেন আমেরিকার জ্যাতির্বিদ এডউইন হাবল (Edwin Hubble) । তিনি ১৯২৯ সালে লক্ষ্য করেন যে বিশ্বজগতের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দুরে সরে যাচ্ছে । অর্থাৎ তিনি আবিস্কার করেন বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত হচ্ছে । ফলে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন এক সময় এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটি পয়েন্ট থেকে (Single Point) ।

এরপর বিজ্ঞানীরা এডউইন হাবলের আবিস্কারের উপর যখন গবেষনা করতে লাগলেন তখন বিজ্ঞানীরা আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলেন যে, বিশ্বজগৎ একক পয়েন্ট বা বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটির মধ্যে চরম ক্ষমতা সম্পন্ন মাধ্যকর্ষন শক্তি ছিল এবং তার ভর ছিল (Mass) শূন্য । আর এই ভরহীন পয়েন্টে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলেই বস্তু ও সময়ের অস্তিত্বলাভ হয় এরপর এই বিশ্বজগতের সম্প্রসারন শুরু হয় । অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রম্ভান্ড সৃষ্টি হয়েছে শূন্য (Nothing) থেকে ।

এই বিগ ব্যাং থিওরী আবিস্কারের ফলে নাস্তিক্যবাদীদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায় এবং তাঁরা ছলে বলে কৌশলে বিজ্ঞানীদের এই আবিস্করকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন । নাস্তিক ও বস্তুবাদী বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন বলেন,

“বর্তমানে আমরা যে প্রকৃতি দেখছি, সেটি একসময় আকস্মিকভাবে অস্তিত্বলাভ করেছিল (অর্থাৎ বিগ ব্যাং থিওরী) আমার কাছে ফিলসফিক্যালি অগ্রহণযোগ্য ।”

তাঁর কাছে বিগ ব্যাং থিওরী অগ্রহণযোগ্য হলেও সময় সেটা বলে দিয়েছে যে বিগ ব্যাং থিওরী একটি নির্ভূল বৈজ্ঞানিক সত্য । পরবর্তীকালে বিভিন্ন আবিস্কারের ফলে আজ প্রমাণিত সত্য যে বিগ ব্যাং থিওরী বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভূল সত্য । উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে যখন আরনো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নামক দুইজন বিজ্ঞানী যখন মহাবিস্ফোরণের অর্থাৎ বিগ ব্যাং থিওরীর তেজস্ক্রিয় অবশেষ চিহ্নিত করেন এবং নব্বই-এর দশকে যখন বিজ্ঞানী কোবে (COBE/Cosmic Bacground Explorer) স্যাটালাইট দ্বারা যখন পর্যবেক্ষণ করেন তখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে বিগ ব্যাং থিওরী আগের শতাব্দীর এক বিস্ময়কর ও চুড়ান্ত সত্য আবিস্কার ।

এরপর শুরু হয় নাস্তিক্যবাদের আত্মহননের পালা । বিগ ব্যাং থিওরী আবিস্কারের পর নাস্তিক্যবাদীরা বিলে যেমন ইঁদুর ঢুকে পড়ে সেইভাবে তাঁরা তাঁদের যে যার বিলে ঢুকে পড়েন । নাস্তিক্যবাদীদের যুক্তির জাল সব ছিন্ন হয়ে যায় । তাঁরা দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো ঘুরতে থাকেন । এই প্রসঙ্গে ‘Atheistic Humanism’ এর লেখক ও ‘Anthony Flew’ এর দর্শনের নাস্তিক অধ্যাপক এন্থনি ফ্লিউ (Anthony Flew) স্বীকার করে বলেন, “স্বীকারোক্তি আত্মার জন্য ভালো বলে কুখ্যাতি আছে । আমি স্বীকার করছি যে, সৃষ্টিত্বসংক্রান্ত সমকালীন সর্বসম্মত মত নাস্তিকদের ভালোরকম বিব্রত করবে । কারণ, বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল - এ কথাটা St Thomas- এর মতে ফিলসফিক্যালি প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও, দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টতত্ত্ববিদরা এর স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঠিকই হাজির করেছেন ।.... (বিশ্বজগতের কোন শুরু বা শেষ নেই - এ ধারণাটা) যদিও আমি এখনো সঠিক বলেই বিশ্বাস করি, তথাপি বলতেই হচ্ছে যে বিগ ব্যাং তত্ত্বের উপস্থিতি ওই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকা মোটেই সহজ ও স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নয় ।”

বস্তুবাদী পদার্থবিজ্ঞানী এইচ পি লিপসনও (H. P Lipson) অনিচ্ছা সত্যেও বিগ ব্যাং থিওরীকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, “আমি মনে করি .....আমাদের অবশ্যই ....স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির ধারণা এ ক্ষেত্রে একমাত্র ধারণা যা গ্রহণ করা যেতে পারে । এটা মেনে নেওয়া আমার মতো অন্য পদার্থবিদদের জন্যও কঠিন । কিন্তু গবেষনালব্ধ প্রমাণাদি যখন একে সমর্থন

করে, তখন তা স্বীকার না করে উপাই বা কি ?” (“A Physicist Looks at Evolution”, Physics Bulletin, Vol. 138, 1980, p. 241/H.P. Lipson)

মোদ্দাকথা বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাং থিওরীর বর্তমানে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটি পয়েন্ট থেকে । বিশ্বজগৎ একক পয়েন্ট বা বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটির মধ্যে চরম ক্ষমতা সম্পন্ন মাধ্যকর্ষন শক্তি ছিল এবং তার ভর ছিল শূন্য । আর এই ভরহীন পয়েন্টে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলেই বস্তু ও সময়ের অস্তিত্বলাভ হয় এরপর এই বিশ্বজগতের সম্প্রসারন শুরু হয় । অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রম্ভান্ড সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকে ।

কুরআনে বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রমাণ

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী ও বস্তুবাদী দার্শনিকরা যে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বিশ্বজগৎ একসময় একটি পয়েন্টে সংলগ (যুক্ত) অবস্থায় ছিল । এবং পরে তা সম্প্রসারিত হয় । এই চুড়ান্ত সত্য বিজ্ঞানীরা নব্বই - এর দশকে স্যাটালাইটের মাধ্যমে প্রমাণ করল । কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে বিগ ব্যাং থিওরীর কথা বলেছেন । যেমন আল্লাহ বলেছেন,

“খোদাদ্রোহীরা কি একথা জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় ছিল, তারপর আমরা তাকে আলাদা আলাদা (পৃথক) করে দিয়েছি এবং আমরা পানি থেকে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি । তবুও তারা বিশ্বাস করবে না ?” (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৩০)

আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রথমে আসমান ও জমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল । একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না । আল্লাহ তাআ'লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন । জমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যাবধান সৃষ্ট করতঃ অত্যান্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।........

হযরত ইকরিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ “পূর্বে রাত ছিল না দিন ?” উত্তরে তিনি বললেন ঃ “প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল । তাহলে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে

অন্ধকার ছিল । আর অন্ধকারের নামই তো রাত । সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল ।'' (তফসীরে ইবনে কাসীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬)

এই মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ফরাসী বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি তাঁর 'দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সায়েন্স' নামক গ্রন্থে যা লিখেছেন, ''মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার । অধুনা এটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ । তবে কিভাবে যে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে এখনো ইতস্তত কিছু মতভেদ রয়ে গেছে ।

মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন পরিচিত আপেক্ষিক থিওরীতে প্রথম উল্লেখিত হয় । যেসব পদার্থবিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোকরশ্মির বর্ণালীবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-রিরীক্ষা ও গবেষনায় নিরত ছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাও মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টা সমর্থন করেছেন । কেননা, তাঁরা দেখতে পান যে, বিভিন্ন ছায়াপথের বর্ণালীবিভা ক্রমান্বয়ে লাল বর্ণের রুপ ধারণ করছে । এর থেকে তাঁরা এই ধারণায় পৌছান যে, একটা ছায়াপথ থেকে আরেকটা ছায়াপথ ক্রমশ দুরে সরে যাচ্ছে । অর্থাৎ মহাবিশ্বের পরিমন্ডল ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে । এখন কথা হচ্ছে, ছায়াপথসমুহ আমাদের নিকট থেকে যত দুরে সরে যাবে, মহাবিশ্বের পরিমন্ডলের পরিধি সম্ভবত বিস্তৃত লাভ করবে ততটাই । তবে, কি রকম গতিতে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়া কাজ চলছে অর্থাৎ মহাশূন্যের ওইসব বস্তু কতটা দ্রুত আমাদের নিকট থেকে দুরে সরে যাচ্ছে, তা একটা প্রশ্ন বটে । মনে হয়, তাদের এই দুরে সরে যাওয়ার গতিটা আলোর গতির কোনো - এক ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে আরো দ্রুততর হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয় ।

কোরআনের একটি আয়াতে যে বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে (সূরা ৫১, আয়াত ৪৭) তার সাথে অনায়াসেই আধুনিক বিজ্ঞান-সমর্থিত মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ-মতবাদের তুলনা করা চলে । উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

'আকাশমন্ডলী, আমরা উহাকে সৃষ্টি করিয়াছি ক্ষমতার বলে । নিশ্চয়ই আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি ।'

এখানে যাকে আকাশমন্ডলী বলা হয়েছে-তা আরবী 'সামাআ' শব্দের অনুবাদ । এর দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবেই পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য জগতের কথাই বোঝানো হয়েছে । 'আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি' এই বাক্যটি হচ্ছে বর্তমান

কাল - বাচক ও বহুবচনসূচক আরবী শব্দ 'মুসিউনা'র অনুবাদ । এর মূল ক্রিয়াবাচক শব্দ হচ্ছে টু 'আউসাআ' । এর অর্থ 'সম্প্রসারিত' করা, আরো বেশী প্রশস্ত করা, বৃদ্ধি করা, বিস্তৃত করা ।" (দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সায়েন্স/ড. মরিস বুকাইলি)

সুতরাং জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দিয়েছেন তা মহান আল্লাহ পাক আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে বলে দিয়েছেন । বিজ্ঞান আজ বলছে 'এই মহা বিশ্ব সম্প্রসারণশীল' এই কথা আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন যখন মানুষ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানত না । সুতরাং মহান আল্লাহ যে আছেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ।

এই বিশ্বকে পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে

এই বিশ্ব ব্রম্ভান্ডকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে । এটা বোঝা যায় সৃষ্টিজগতের মধ্যে সুক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর দৃষ্টিপাত করলে । নাস্তিক্যবাদীরা আগে মনে করেছিলেন দৈবক্রমে হঠাৎ কোন মাধ্যম ব্যাতিরেকেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল । এর পিছনে কো স্রষ্টার হাত নেই । তাঁরা মনে করেছিলেন সৃষ্টির পিছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না । কিন্তু জ্যাতির্বিদ্যা নাস্তিক্যবাদীদের এই দাবীকে বাতিল করে দিয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে জ্যাতির্বিদরা একথা স্বীকার করেছেন যে, এই বিশ্বের একটা সুক্ষ্ম পরিকল্পনা বিরাজ করছে এবং একটা সুক্ষ্ম ভারসাম্য বিরাজ করছে । বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, বিশ্ব জগতের বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক ও জীব বৈজ্ঞানিক নিয়মসমূহ; মাধ্যকর্ষন শক্তি ও ইলেক্ট্রো - ম্যাগনেটিজম অনুর গঠনশৈলী ইত্যাদি সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেভাবে সৃষ্টি করার উপর মানবজীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে । অতি সুক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে । যেন এই বিশ্বজগৎ একটি পরিকল্পিত নক্সা । পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এই নক্সার নাম দিয়েছেন, 'এ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল' (Anthropic Principle) । এক কথায় মানবজাতিকে সামনে রেখে অর্থাৎ মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করেই এই সব সৃষ্টি করা হয়েছে ।

বিগ ব্যাং থিওরীতে বলা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বজগৎ একপ্রকার অতিঘন জমাট বাঁধা পদার্থ পুঞ্জের তীব্র বিস্ফোরণে গড়ে উঠেছে । এই বিস্ফোরণের ফলে

উৎপাদিত তারকাপুঞ্জ বা অসংখ্য নক্ষত্র সমন্বিত নক্ষত্র মন্ডলগুলি সমগ্রমহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে ও একে অপরের থেকে প্রচন্ড গতিতে দুরে সরে যায় । এগুলি প্রায় প্রতি ঘন্টায় ৬০০ মিলিয়ান কিলোমিটারের বেগে ধাবিত হয়ে মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে । এবং সেই থেকে এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হতে শুরু করেছে । বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন যে গতিতে এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে তার এই গতি যদি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও কমবেশী হত তাহলে এই মহাবিশ্ব কোনক্রমেই আজকের অবস্থানে পৌঁছতে পারতো না । সুতরাং এই মহাবিশ্বকে অতি সুপরিকল্পিত ভাবেই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, এই মহাবিশ্বে চার ধরণের প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করছে । সেগুলির মধ্যে ১) মধ্যাকর্ষণ শক্তি, ২) দুর্বল পারমানবিক শক্তি, ৩) শক্তিশালী পারমানবিক শক্তি এবং ৪) ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক শক্তি । বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই চার শক্তি সুশৃঙ্খল জগতে অস্তিত্ব লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক সেই মাত্রাই রয়েছে । এই চার ধরণের শক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি যদি কোটি কোটি কোটি কোটো ভাগেরও এক ভাগ যদি কমবেশি হত তাহলে এই ব্রম্ভাণ্ডে মনুষ বা কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না । সমস্ত জায়গায় শুধু হাইড্রোজেন গ্যাস ও বিচ্ছুরিত রশ্মি ছাড়া আর কিছু থাকতো না ।

এছাড়াও এই বিশ্ব ব্রম্ভাণ্ড আরো অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম এমন বিষয় রয়েছে যা সামান্য হেরফের হলে এই ব্রম্ভাণ্ডে প্রাণীর বসবাসের কোন উপযোগী স্থান থাকতো না । যেমন সূর্য যেখানে রয়েছে যদি তা সামান্য উপরে উঠে যেত তাহলে সারা বিশ্ব হীম শীতল হয়ে যেত, কিংবা যদি সামান্য নিচে নেমে আসত তাহলে সারা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত । চাঁদ যে স্থানে রয়েছে যদি তা সামান্য উপরে উঠে যেত তাহলে সারা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত এবং যদি সামান্য নিচে মেনে যেত তাহলে সারা পৃথিবীতে সামুদ্রিক জলচ্ছ্বাস হয়ে পৃথিবীতে শুধু সাগর ছাড়া স্থল বলে কিছু থাকতো না । জলের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ, সূর্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের গ্যাসের নিখুঁত আনুপাতিক হার, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কিংবা যদি বাস্তুতন্ত্রে সামান্য হেরফের হত তাহলে মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারত না ।

সুতরাং এই বিশ্বজগতে সর্বত্র এক আশ্চর্য ধরণের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভারসাম্য বিরাজ করছে । এই তত্ত্ব আবিস্কার করেছে বর্তমান নভোবিজ্ঞানীরা । জ্যাতির্বিজ্ঞানী পল ডেভিস (Paul Davies) তাঁর 'দি কসমিক ব্লু প্রিন্ট' (The Cosmic

Blueprint) নামক গ্রন্থে বলেছেন, “The impression of Design is overwhelming” অর্থাৎ “বিশ্বজগতে একটি পরিকল্পতি ডিজাইনের প্রভাব অপরিসীম ।”

নভোবিজ্ঞানী ডব্লিউ প্রেস (W. Press) লিখেছেন, “বিশ্বজগতে একটি চমৎকার ডিজাইনের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয় । এ ডিজাইন (পৃথিবীতে) বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক ।” (Jaurnal Nature)

মজার কথা হচ্ছে যেসব বিজ্ঞানী সৃষ্টির পিছনে একটি সুক্ষ্ম পরিকল্পনা রয়েছে একথা বলেছেন তাঁরা অধিকাংশই বস্তুবাদী ভাবধারার ব্যাক্তি ছিলেন । তাঁরা কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য গবেষনা করেন নাই । তাঁরা নিছক বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গবেষনা করতে গিয়েই এইসব বিষয়বস্তু লক্ষ্য করেছেন । তাঁদের গবেষনার ফলাফলই প্রমাণ করে যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মহাপরিকল্পনার পিছনে একজন পরিকল্পক থাকাটাই স্বাভাবিক ।

মার্কিন জ্যাতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্রীনষ্টেইন (George Greenstein) বলেছেন, “(জীবনের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সূত্র সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারটি) কিভাবে ব্যাখ্যা করা চলে ? ...... প্রাপ্ত সম্ভাব্য সকল তথ্যপ্রমাণ বিচার করলে তাৎক্ষণিক ভাবে মনে হয় যে, কিছু অতিপ্রাকৃতিক এজেন্সী বা সঠিকভাবে বললে, একটি এজেন্সী (বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পিছনে) ক্রীয়াশীল আছে । এটা কি সম্ভব যে, ইচ্ছায় নয় বরং হঠাৎ করেই আমরা এমনসব বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি যেগুলো একজন সর্বোচ্চ সত্তার (Supreme Being) অস্তিত্ব প্রমাণ করে ? আমাদের সুবিধার্থে এ বিশ্বজগৎ অত্যন্ত বিচক্ষনতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন কি বতে আল্লাহ -ই ?” (The Symbiotic Universe)

এই কথায় কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমরা আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝখানের সবকিছু অকারণে সৃষ্টি করি নাই । অবিশ্বাসীরাই কেবল (অকারণে সৃষ্টির) ধারণা পোষন করে ।” (কুরআন, ৩৮ : ২৭)

কুরআন যা চৌদ্দশত বছর আগে বলেছে তা বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর সত্তর এর দশকে এসে স্বীকার করেছেন স্বতর্স্ফূর্তভাবে ।

আমেরিকার প্রজননবিদ্যা বিষেশজ্ঞ (Geneticist) রবার্ট গ্রিফিথস (Robert Griffiths) বলেছেন, "বিতর্কের জন্য আমার যখন একজন নাস্তিকের প্রয়োজন পড়ে তখন আমি দর্শন বিভাগে যাই । পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এ - ক্ষেতে আমাকে সাহায্য করেনা ।" (Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, Page-123)

সুতরাং রবার্ট গ্রিফিথসের মতো প্রজননবিদ মনে করেন পদার্থবিজ্ঞানে নাস্তিকতার কোন স্থান নেই ।

কানাডার রয়েল সোসাইটির টোরি গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত জীব পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক অ্যালেন লিখেছেন, "প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী করে এ পৃথিবীকে এমনিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এতে এমনি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, সেগুলো বিচার করলে কোন অবস্থাতেই বলা চলে না যে নিজ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ।" (The Evidence of GOD in Expanding Universe-edited by John Clover Monsma)

তাই আমরা বলব, নাস্তিক্যবাদ বা বস্তুবাদ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও বিকৃত চিন্তাধারা যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে । বিজ্ঞানীরা এখন নাস্তিক্যবাদকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ঘোষনা করতে আরম্ভ করেছেন । বিজ্ঞানীরা তো এখন প্রকাশ্যে বস্তুবাদের পতনের কথা বলতে শুরু করেছেন ।

কুরআনে ভ্রূণবিদ্যার প্রমাণ

কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াদের কিছু লোক কুরআনে ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে যেসব আয়াত আছে সেসব আয়াত এক জায়গায় জমা করেন এবং এর উপর গবেষণা করার জন্য টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলিম ভ্রূণতত্ত্ববিদ উইলিয়াম কিথ মূরকে নির্বাচন করা হয় । এই উইলিয়াম কিথ মূর হলেন একজন ভ্রূণ তত্ত্বের উপর গবেষক এবং এর উপর অনেক গ্রন্থ রচনাকারী বিজ্ঞানী । রিয়াদে কিথ মূরকে আমন্ত্রন করে বলা হয়, "কুরআন আপনার বিষয় সম্বন্ধে যা বলেছে তা হল এই । এটা কি সত্যি ? আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি বলতে পারেন ?"

ড. কিথ মূর যতদিন আরবে ছিলেন ততদিন আরবীয়রা তাঁকে কুরআনের সবরকম অনুবাদ দিয়ে সহযোগিতা করেন । গবেষনা করার পর ড. কিথ মূর এতটাই বিস্মিত হন যে, তিনি তাঁর লেখা পাঠ্যবইগুলিকে পরিবর্তন করেন ।

তিনি এর আগে “Before we are born” (আমাদের জন্মের আগে) নামে বই লিখেছিলেন তাও তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে ‘ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস’ সংক্রান্ত অধ্যায়ে কুরআন পড়ে যা কিছু আবিস্কার করেন তা সংযোজন করেন যা আগের সংস্করণে ছিল না ।

টেলিভিশনের সাক্ষাতকারে ড. কিথ মূর বলেন, মানুষের বৃদ্ধির কিছু কিছু ব্যাপারে (মাতৃগর্ভে) কুরআন যা বলছে মাত্র ত্রিশ বছর পূর্বেও তা জানা ছিল না । তিনি বলেন, বিশেষ করে এ ব্যাপারে কুরআন একটি স্তরে মানুষকে বর্ণনা করেছে, “জোঁক সদৃশ্য জমাট বাঁধা রক্ত” হিসাবে । (সুরা আল হাজ্ব, আয়াত ২২) এইসব পড়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান এবং তিনি প্রাণীবিদ্যা বিভাগে গিয়ে একটি জোঁকের ছবি সংগ্রহ করে মানব ভ্রূণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন কুরআন ভ্রূণ সম্পর্কে যা কিছু তথ্য দিয়েছে তা সঠিক । তিনি বলেন, “এ ব্যাপারে আমি কখনোই চিন্তা করিনি ।” তিনি এইসব তথ্য পরে নিজের ভ্রূণতত্ত্ব সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে সংযোজন করেন ।

ড. কিথ মূর এইসব গবেষণা করার পর ভ্রূণতত্ত্বের উপর আর একটি স্বতন্ত্র বই লেখেন এবং যখন তিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব তথ্য হাজির করেন, তখন তাও সমগ্র কানাডার পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় এবং কিছু পত্রিকায় তা প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয় । এই তথ্য প্রাকাশের শিরোনাম ছিল, “পুরানো প্রার্থনার বইয়ে (অর্থাৎ কুরআন শরীফে) বিস্ময়কর বস্তুর সন্ধান ।”

এই পত্রিকার রিপোর্টার ড. কিথ মূরকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনি কি এটা মনে করেন না যে, আরবরা পূর্ব থেকেই এসব ব্যাপারে অবশ্যই জেনে থাকবে, ভ্রূনের বর্ণনা, এর আকৃতি এবং কিভাবে এটা পরিবর্তিত হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে ? তারা বৈজ্ঞানিক না হতে পারে, কিন্তু হতে পারে তারা পূর্বে নিজেদের উপর কোন অমার্জিত স্থুল পন্থায় কাটা ছেড়া চালিয়েছিল, লোকদের কেটেকুটে এসব জিনিজ দেখেছিল ?” উত্তরে ড. কিথ মূর তৎক্ষনাৎ বুঝিয়ে দেন যে, সে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছে ভ্রূণের সকল স্লাইড যা দেখানো হয়েছে এবং পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছে তার সবই অনুবিক্ষন যন্ত্রের ভিতর তোলা ছবি । তিনি সেই রিপোর্টারকে আরও বলেন, “চৌদ্দশ বছর পূর্বে যদি কেউ ভ্রূণতত্ত্ব আবিস্কারের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তাতে কিছু যায় আসে না । তারা এটাকে দেখতে পারেনি ।”

ভ্রূণের আকৃতির ব্যাপারে, আল কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে, যখন তা থাকে খুবই ক্ষুদ্র যাকে খালি চোখে দেখা যায় না; সুতরাং তা দেখতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের

প্রয়োজন হয় । যেহেতু এরকম যন্ত্রপাতির অভিজ্ঞতা মাত্র দু'শ বছরের কিছু আগের, তাই কিথ মূর সেই রিপোর্টারকে বিদ্রুপ করে বলেন, "সম্ভবত চৌদ্দশত বছর পূর্বে গোপনে কারো অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, সে এ ব্যাপারেই গবেষণা চালিয়েছিল এবং কোথাও সে কোন ভুল ভ্রান্তি করেনি । তারপর সে কোনভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ) দেখায় এবং তাকে এ তথ্যটি তার বইয়ে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাজী করায় । তারপর সে তার যন্ত্রটি ধ্বংশ করে ফেলে এবং চিরকালের জন্য এটা গোপন রাখে । এটা কি তুমি বিশ্বাস করবে ? আসলেই এমন কোন কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, যতক্ষন না তুমি কোন প্রমাণ পেশ করো । কারণ তোমার কথা খুবই হাস্যকর এবং একেবারেই অদ্ভুত ।" নিরুপায় ও লা-জবাব হয়ে রিপোর্টার ড. কিথ মূরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুরআনের এই তত্ত্ব কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন ?" ড. কিথ মূর উত্তরে বলেন, "এ তত্ত্বের একমাত্র ঐশ্বরিক ভাবেই নাজিল (অবতীর্ন) হতে পারে । এসব মানুষের জানার সাধ্যের বাইরে ।"

ভ্রূণতত্ত্ববিদ ড. উইলিয়াম কিথ মূরের এই গবেষণা ও বক্তব্য বস্তুবাদী তথা নাস্তিক্যবাদীদের মুখে এক বিরাট থাপ্পড় । তিনি এটাই বলেছেন, আজকের বিজ্ঞান গবেষণার পর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আল্লাহ চৌদ্দশত বছর আগে কুরআনের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন । সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহ অস্তিত্বের প্রমাণ সহজেই বুঝে আসে এবং নাস্তিক্যবাদ যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী এবং ভ্রান্ত মতবাদ তা স্পষ্ট হয়ে যায় ।

হাদীস শরীফে জ্বীনতত্ত্বের (Genetics) প্রমাণ

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ! আমার একটি কালো সন্তান হয়েছে । ঐ ব্যক্তি স্বভাবতই কালো রংয়ের সন্তান আশা করেননি । নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভিন্নতর একটি প্রশ্ন ঃ তোমার উট আছে ? লোকটি উত্তর দিল - জি আছে । উটগুলির রং কি ? নবীজী আবারও জিজ্ঞাসা করলেন । লোকটি উত্তর দিল লাল রংয়ের । নবীজীর পরের প্রশ্ন ঃ সব লাল রংয়ের, একটাও কি ধুসর বর্ণের নেই ? এবার লোকটি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা ধুসর বর্ণের উট আছে বটে । এবার নবীজী লোকটিকে প্রশ্ন করলেন ঃ অনেক লাল উটের মধ্যে হঠাৎ ধুসর উট আসল কেমন করে ?

একটা গুপ্ত বৈশিষ্ট (জ্বীনতত্ত্ব) এই ধুসর রংটিকে টেনে বার করে এনেছে । তোমার সন্তানের কালো রংটিও টেনে বের করে এনেছে একটি গুপ্ত বৈশিষ্ট ।

এই হাদীসে আল্লাহর নবী (সাঃ) জ্বীনতত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই গুপ্ত বৈশিষ্টকে Genetics বা বংশগতি বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Hidden trait । পাঠকগণ চিন্তা করুন ! যে গুপ্ত বৈশিষ্ট বা জ্বিনতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহু পরে ধারণা দিয়েছেন তা আমাদের নবী (সাঃ) আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে বলে গেছেন । এই Recessive Genes বা Genes এর কথায় Genetecist রা জানতে পেরেছেন অনেক পরে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মানবদেহে বিভিন্ন Tratis বা বৈশিষ্টের জন্য এক বা একাধিক Gene দায়ী । Gene হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত DNA বা De-oxyribo Nucleic Acid যে Master বা বংশগতির নীল নকসা নির্ধারিত অনু রয়েছে, তার অংশবিশেষ যা কয়েকটি Chemical components দিয়ে তৈরী । বংশ পরাক্রমে এই Gene গুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয় প্রজনন কোষের মাধ্যমে । যেসব বাবা মা'র চোখ কালো তাদের সন্তানের চোখ কালো হবে - সেটাই স্বাভাবিক । এ ক্ষেত্রে কালো চোখের জন্য যে Genes দায়ী, সেগুলো সন্তানের মধ্যে সরাসরি প্রকাশিত হয় । এগুলোকে বলা হয় Dominant Gene ।

এখন বংশগতির কোনও এক পর্যায়ে কোনও এক পূর্ব পুরুষের নীল চোখ থেকে থাকে Genes গুলো সরাসরি প্রকাশিত না হয়ে বেশ কয়েক Generation বা প্রজন্ম ধরে Hidden বা সুপ্ত থাকতে পারে এবং হঠাৎ কালো চোখওয়ালা বাবা এবং কালো চোখওয়ালা মা'র সন্তানের মধ্যে সেই পূর্ব পুরুষের নীল চোখের জন্য দায়ী Genes গুলো, যেগুলো এতকাল Recessive বা সুপ্ত ছিল, সেগুলো যদি হঠাৎ করে প্রকাশ পায় তবে বাবা মা'র চোখ কালো হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের চোখ নীল হতে পারে এবং তা মাঝে মধ্যে হতেও দেখা যায় । বাবা মা'র গায়ের রং সাদা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের রং কালো হতে পারে সেটি ঠিক এই কারণেই ।

আমরা এতদিন পরে জানতে পারলাম যে গুপ্ত বৈশিষ্টের জন্য মানুষ সাদা থাকলেও তার সন্তান সন্ততি কালো হতে পারে কিন্তু এই সত্য আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে মহান আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন । বিজ্ঞানীরা আজ বলছে, জ্বীন জীব শরীরে গুপ্ত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে পরে কোন এক পুরুষের মধ্য তা প্রকাশ পায় । মহানবী (সাঃ) সেটাকেই বলেছেন গুপ্ত বৈশিষ্ট ।

নবী (সাঃ) এই হাদীসটিতে আরও একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উটের বৈশিষ্টের সঙ্গে মানুষের বৈশিষ্টের তুলনা করেছেন । অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে Law of heredity অর্থাৎ বংশগতির নিয়ম কানুন জীবজন্তু ও মানুষের বেলায় Similar বা সদৃশ এবং এটাই আধুনিক বংশগতিরও কথা ।

সুতরাং এই মহাবিশ্বের অন্তরালে একজন অতীন্দ্রিয় মহাশক্তিধর সত্তা রয়েছেন তা যদি নাহয় তাহলে আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে নবী (সাঃ) এই জ্বিনতত্ত্ব সম্পর্কে জানলেন কি করে ? অথচ তিনি কোন স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেননি । তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন । যদি নাস্তিকরা একথা না মানেন তাহলে মহানবী (সাঃ) যে জ্বিনতত্ত্ব সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের দিয়েছেন সেটিকে ব্যাখ্যা করবেন কি করে ?

কুরআনের বিরুদ্ধে নাস্তিক তসলিমা নাসরিনের মিথ্যা অপবাদ ও তার খন্ডন

বোম্বে থেকে প্রকাশিত ফ্যাশান ম্যাগাজিন ‘Savvy’ তার নভেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় নাস্তিক লেখিকা তসলিমা নাসরিনের স্বাক্ষরযুক্ত এক বিশাল আত্মকাহিনী প্রকাশ করেছে । এতে কুরআন, ইসলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, যৌন স্বাধীনতা, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে তসলিমা খোলাখুলি আলোচনা করেছেন । এতে তিনি কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস করেছেন ।

তিনি লিখেছেন, “আমাদের দেশের জীবনধারার একটি আদর্শ নমুনা আমার মা । সে খুব ধর্মাপরায়ণা । তার কথাবার্তা ও কাজকর্মকে আমি ঘৃণা করি । সব সময় সে আমাকে বলে, ‘আল্লাহতে তুমি বিশ্বাস রাখনা - আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন । তুমি একজন (ইসলাম পরিত্যাগকারিণী) ।’ আমি বাল্যকালে যখন খেলা করতাম, তখন ঐ মা আমাকে নামাজ পড়ার জন্য ডাকতো । কিন্তু আমি নামাজ বা কোরান পড়া পছন্দ করতাম না । আমি কোরান বিশ্বাস করি না । আমি যখন কোরান পড়েছিলাম, তখন তাতে দেখেছি, কোরানে বলা হয়েছে - ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ।’ আমি তখন আমার মাতৃদেবীকে বলেছিলাম, ‘আমি বিজ্ঞানের বই পড়ে জেনেছি যে সূর্যেরই চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে । কাজেই আল্লাহ একজন মিথ্যাবাদী ।’ মা রেগে বললো, ‘কখনো তাঁর (আল্লাহর) কথার সঙ্গে দ্বিমত হয়ো

না। আখারাত ! মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন।' মূল বিষয় হচ্ছে যে, আমি চিন্তা করে বুঝেছি কোরানে সূর্যের ব্যাপারে যা লেখা আছে তা মিথ্যা এবং আমি কখনোই এ ব্যাপারে একমত হতে পারব না। সেজন্য আমি নামাজ পড়ি না।" (সৌজন্যে ঃ সাপ্তাহিক কলম ২রা জানুয়ারী ১৯৯৩/তথ্যসূত্র ঃ তসলিমা নাসরিনের স্বরুপ সন্ধানে, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩, আবু ওবায়দা, মল্লিক ব্রাদার্স কোলকাতা থেকে প্রকাশিত)

এখানে তসলিমা নাসরিন স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তিনি কুরআন শরীফ পড়ে দেখেছেন যে তাতে লেখা আছে, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।' অথচ এটা তসলিমা নাসরিনের সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাষন। কুরআন শরীফের ৩০ পারা ১১৪টি সুরা ৬৬৬৬ টা আয়াতের মধ্যে কোথায় এই কথা লেখা নেই যে 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।' তসলিমা নাসরিনের এই মিথ্যা ভাষন পড়েই বোঝা যায় যে তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী। বরং কুরআনে একথাই লেখা আছে যে এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিক কক্ষপথে আবর্তন করছে।

তসলিমা নাসরিন কুরআন শরীফের বিন্দু বিসর্গ না পড়েই কেবল বাগাড়ম্বড়ই করেছেন এবং বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে নিজের মুর্খতাকে বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

তসলিমার দাবী যে তিনি এই জন্যই নামাজ পড়েন না এবং কুরআন বিশ্বাস করেন না যে কুরআনে আল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এবং আল্লাহ বলেছেন, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।' আর বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। অর্থাৎ তসলিমাকে যদি কুরআন শরীফ খুলে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে সেখানে লেখা আছে এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিক কক্ষপথে আবর্তন করছে তাহলে তিনি আল্লাহকে সত্যবাদী বলে মনে করবেন এবং তিনি নামাজ পড়া শুরু করে দেবেন। তাই না ?

তাহলে আসুন আমরা দেখি এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে কুরআন আমাদের কি বলছে। কুরআন শরীফের সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, "ওয়াহুয়াল্লাযী খালাক্বাল লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ওয়াস শামসা ওয়াল ক্বামারা, কুল্লুন ফি ফালাকিঁই ইয়াসবাহুন।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র । অন্তরিক্ষে যা আছে তা প্রত্যেকে নিজ নিজ পক্ষপথে আবর্তন করে ।

নিচে মূল আরবী 'তফসিয়ে বায়যাবী' থেকে সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতের স্ক্রীন শর্টটা লক্ষ্য করুন

أنوار التنزيل وأسرار التأويل

المعروف

بتفسير البيضاوي

تأليف

ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي

(ت ٦٩١ هـ)

إعداد وتقديم

محمد عبد الرحمن المرعشلي

دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي

بيروت

www.kitabosunnat.com

٥٠ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي

ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإن عدي بعلى فبالعكس.

﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ من الملائكة أو من الخلائق. ﴿إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ يريد به نفي البنوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ من ظلم بالإشراك وادعاء الربوبية.

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)﴾.

﴿أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أو لم يعلموا، وقرأ ابن كثير بغير واو. ﴿أَنَّ السَّمواتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً﴾ ذات رتق أو مرتوقتين، وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ بالتنويع والتمييز، أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً، وكانت الأرضون واحدة فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل ﴿كانتا﴾ بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل ﴿كانتا رتقاً﴾ لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات، فيكون المراد بـ ﴿السموات﴾ سماء الدنيا وجمعها باعتبار الآفاق أو ﴿السموات﴾ بأسرارها على أن لها مدخلاً ما في الأمطار، والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسط، أو استفساراً من العلماء ومطالعة للكتب، وإنما قال ﴿كانتا﴾ ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض. وقرىء «رتقاً» بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض. ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ﴾ وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى ﴿الله خلق كل دابة من ماء﴾ وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه، أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء «حياً» على أنه صفة ﴿كل﴾ أو مفعول ثان، والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. ﴿أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾ مع ظهور الآيات.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣١) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٢)﴾.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ كراهة أن تميل بهم وتضطرب، وقيل لأن لا تميد فحذف لا لأمن الإلباس. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ في الأرض أو الرواسي. ﴿فِجَاجاً سُبُلاً﴾ مسالك واسعة وإنما قدم فجاجاً وهو وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك، أو ليبدل منها ﴿سبلاً﴾ فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى مصالحهم.

﴿وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴾ عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته، أو استراق السمع بالشهب. ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة. ﴿مُعْرِضُونَ﴾ غير متفكرين.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)﴾.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ﴾ بيان لبعض تلك الآيات. ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ أي كل واحد منهما، والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجنس كقولهم: كساهم الأمير حلة. ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء، وهو خبر ﴿كُلٌّ﴾ والجملة حال من ﴿الشمس

কুরআন শরীফের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, "লাস শামসু ইয়ামবাগী লাহা আন তুদরীকাল ক্বামারা ওয়াললাইলী সাবিকুন নাহার, কুল্লুন ফি ফালাকিঁই ইয়াসবাহুন ।" (সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০)

অর্থাৎ সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং অন্তরিক্ষে যা আছে তা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন (সন্তরণ) করে ।

নিচে মূল আরবী 'তফসিয়ে বায়যাবী' থেকে সুরা ইয়াসিনের ৪০ নং আয়াতের স্ক্রীন শর্টটা লক্ষ্য করুন

www.kitabosunnat.com

٢٦٨ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي

﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

﴿ليأكلوا من ثمره﴾ ثمر ما ذكر وهو الجنات، وقيل الضمير لله تعالى على طريقة الالتفات والإضافة إليه لأن الثمر بخلقه، وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه، أو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون. ﴿وما عملته أيديهم﴾ عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما، وقيل ﴿ما﴾ نافية والمراد أن الثمر بخلق الله لا بفعلهم، ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها. ﴿أفلا يشكرون﴾ أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه.

﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها﴾ الأنواع والأصناف. ﴿مما تنبت الأرض﴾ من النبات والشجر. ﴿ومن أنفسهم﴾ الذكر والأنثى. ﴿ومما لا يعلمون﴾ وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته.

﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾﴾.

﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ نزيله ونكشفه عن مكانه مستعار من سلخ الجلد والكلام في إعرابه ما سبق. ﴿فإذا هم مظلمون﴾ داخلون في الظلام.

﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾ لحد معين ينتهي إليه دورها، فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره، أو لكبد السماء فإن حركتها فيه يوجد فيها بطء بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال:

والشمس حيرى لها بالجو تدويم

أو لاستقرار لها على نهج مخصوص، أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلثمائة وستين مشرقاً ومغرباً، تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل، أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وقرىء «لا مستقر لها» أي لا سكون فإنها متحركة دائماً و «لا مستقر» على أن «لا» بمعنى ليس. ﴿ذلك﴾ الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي تكل الفطن عن إحصائها. ﴿تقدير العزيز﴾ الغالب بقدرته على كل مقدور. ﴿العليم﴾ المحيط علمه بكل معلوم.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾.

﴿والقمر قدرناه﴾ قدرنا مسيره. ﴿منازل﴾ أو سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون: الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانا، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعدالسعود، سعد الأخبية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر، الرشا، وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبيل الإجتماع دق واستقوس، وقرأ الكوفيون وابن عامر ﴿والقمر﴾ بنصب الراء. ﴿حتى عاد كالعرجون﴾ كالشمراخ المعوج، فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج، وقرىء «كالعرجون» وهما لغتان كالبزيون والبزيون. ﴿القديم﴾ العتيق وقيل ما مر عليه حول فصاعداً.

﴿لا الشمس ينبغي لها﴾ يصح لها ويتسهل. ﴿أن تدرك القمر﴾ في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

এখানে স্পষ্ট ভাষায় কুরআন শরীফে লেখা আছে যে এই মহাকাশে যা কিছু আছে তা সবই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে । এখানে 'ইয়াসবাহা' আরবী শব্দ 'সাবাহা' থেকে এসেছে যার অর্থ চলমান কিছুর গতি এবং আরবী 'ফালাক্ব' শব্দের অর্থ হল মহাকাশ । এককথায় এখানে কুরআনে বলা হয়েছে যে মহাকাশে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে । সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের কোন সংঘর্ষ নেই । অথচ তসলিমা নাসরিন মিথ্যা কথা বলে মানুষকে একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে কুরআন শরীফে নাকি বলা হয়েছে, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ।' অথচ এই কথা পুরো কুরআন শরীফ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও পাওয়া যাবে না ।

তসলিমা নাসরিন, এবার তো আপনাকে প্রমাণ করে দেওয়া হল যে কুরআন শরীফের সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত থেকে ও সুরা ইয়াসিনের ৪০ নং আয়াত থেকে যে আল্লাহ বলেছেন, এই মহাকাশের যা কিছু আছে তা নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে । এই ব্যাপারে বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআন একমত । এইবার তো বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ মিথ্যাবাদী নন । আল্লাহ সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী আপনি স্বয়ং । এইবার তো আপনি নামাজ পড়বেন না কি নিজের হেঁকড়ি বজায় রেখে পাল্টি মারবেন । চলুন আপনার নামাজ পড়া না পড়া আপনার নিজস্ব ব্যাপার

আপনি নামাজ না পড়ে কুরআন অবিশ্বাস করলে এই বিশ্বের প্রায় দুইশত কোটি মুসলমানের কিছু ছেঁড়া যাবে এটা আপনি ভালভাবেই জানেন । তবে কুরআনের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে, নিজের মিথ্যাকে কুরআনের উপর আরোপিত করে পাঁয়তারা করতে গেলে আপনার গর্দান আপনার শরীরের সঙ্গে একদিন বেওয়াফাই করে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পতিত হবে ।

প্রিয় পাঠক ! তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন মৎপ্রণীত ‘তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে’ ।

কুরআন শরীফ সম্পর্কে ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী’র বক্তব্য

মরিস বুকাইলী হলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী । তিনি কুরআন শরীফ, বাইবেল ও আধুনিক বিজ্ঞানের উপর তুলনামূলক গবেষণা করে একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন তার নাম ‘দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড দি সায়েন্স’ (The Bible the Quran and the science) । এই গ্রন্থেছর মধ্যে তিনি বলেছেন, “কুরআনকে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করেছি । প্রথমে অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি । তারপর আমি আরবী শিখেছি এবং বিজ্ঞানের সত্য আল কুরআনে বর্ণিত বক্তব্য পাশাপাশি রেখে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং সংগৃহীত যাবতীয় প্রমাণ দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরআনে এমন একটা বক্তব্য নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসত্য বা ভ্রান্তিপূর্ণ ।”

ড. মরিস বুকাইলী আরও বলেছেন, “আমার প্রথম উদ্দেশ্যে ছিল কুরআনের প্রত্যেকটি বক্তব্যকে বিচার - বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে কুরআনের অসারতা প্রমাণ করা । কিন্তু যতই কুরআন পড়া শুরু করলাম, দেখতে পেলাম, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় কি সঠিকভাবেই না কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে । একটা বিষয় আমার কাছে সব চাইতে বেশী অদ্ভুত মনে হচ্ছিল আজকার যুগের যে সব বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা এত চিন্তা - ভাবনা, পরীক্ষা - নিরীক্ষা বা গবেষণা করে পাচ্ছি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর যুগে বসে কি করে সে সব বিষয় একজন মানুষ তা জানতে পারলো, প্রকাশ করতে পারলো ? সে যুগে এসব বিষয়ে মানুষের তো ধারণাই থাকার কথা নয় !”

ড. মরিস বুকাইলী আরও বলেছেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ) যিনি ছিলেন নিরক্ষর। সেই নিরক্ষর লোকটির দ্বারা কিভাবে সেই সময়কার আরবের এ রকম একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম রচিত হতে পারে ? শুধু কি তাই ? সেই নিরক্ষর লোকটির পক্ষেই বা কিভাবে সম্ভব বিজ্ঞানের, প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর এমনভাবে সত্য ও নির্ভূল তথ্য তুলে ধরা, যা সে সময়ের কোন লোকের চিন্তারও অগোচরে থাকার কথা, এবং সেই সব দুরুহ বিষয় সংক্রান্ত সত্য ও তথ্যের বর্ণনায় কোথায়ও একবিন্দু ত্রুটি কিংবা বিচ্যুত খুঁজে পাওয়া দুস্কর।"

ড. মরিস বুকাইলী আরও বলেছেন, "সপ্ত শতাব্দীতে জীবিত কোন মানুষের পক্ষেই শত শত বছর পরে আবিস্কৃত বিজ্ঞানের এইসব প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও সত্য, বিচিত্র জ্ঞান ও তথ্য বুঝতে পারা ও প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়।"

ড. মরিস বুকাইলীর কুরআন সম্পর্কে এই বক্তব্য নাস্তিক্যবাদীদের বালুকা প্রাচীর দুমড়ে মুচড়ে এককার করে দেয়। ড. বুকাইলী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে যেসব বিজ্ঞানের তত্ত্ব আমরা এই শতাব্দীতে এসে আবিস্কার করেছি তা মহান আল্লাহ আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। আর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যাক্তি। তিনি পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে পড়াশুনা করেন নি। তাহলে একজন নিরক্ষর ব্যাক্তি কিভাবে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য অবগত হয়ে কুরআনে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন ? ড. বুকাইলী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে কুরআন শরীফ কোন মানুষের রচনা নয়। এটা নিঃসন্দেহে মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ন ঐশী গ্রন্থ।

সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব আছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা বিজ্ঞান যা আজকের যুগে প্রমাণ করছে তা আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে কিভাবে আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন ?

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে শীর্ষস্থানী ধর্মের ভবিষ্যৎবাণী

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদে আছে,

‘নরাশংস প্রতিধামান্যজ্জন তিস্রো দিবঃ প্রতিমহ্ন স্বচিঃ’

(ঋগ্বেদ সংহিতা ২/৩/২)

‘নরাশংস মিহাপ্রিয় মস্মিন্যজ্ঞ উপবয়ে মধুজিহ্ন হবিকৃতম’

(ঋগ্বেদ সংহিতা)

অথর্ববেদে আছে, ‘‘লোকেরা শোন । নরাশংসকে (মুহাম্মাদ) লোকেদের মাঝে প্রেরণ করা হবে । সেই স্বদেশত্যগীকে আমরা ৬০,০৯০ জন শত্রুর কাছ থেকে নিজের আশ্রয় গ্রহণ করব । তাঁর বাহন হবে উঁট । তাঁর সঙ্গে কুড়িটি উট থাকবে । আকাশকেউ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবনমিত করবে । সেই মহান ঋষিকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, দশটি গলার হার, ৩০০ ঘোড়া এবং ১০,০০০ গাভী দান করা হয়েছে ।’’ (২০-১২৭-১-২-৩)

এই নরাশংস কে তা প্রমান করতে গিয়ে পন্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ‘নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি’ নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেই বলেছেন । তিনি প্রমান করেছেন, রুপক ভাষায় ১০০ স্বর্ণমুদ্রা মানে হল ১০০ জন আসহাবে সুফ্ফা । ১০ গলার হার মানে হল দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যাক্তি (আশারায়ে মুবাশ্শারা) ৩০০ ঘোড়া বলতে বদর যুদ্ধের ৩১৩ জন যোদ্ধা বোঝানো হয়েছে । আর বাকি ১০,০০০ গাভী বলতে মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ১০,০০০ সঙ্গী যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে ।

আর ‘নরাশংস’ মানে হল প্রশংসিত ব্যাক্তি । অপরদিকে ‘মুহাম্মাদ’ মানেও হল প্রশংসিত ব্যাক্তি । সুতরাং ‘নরাশংস’কে আরবীতে অনুবাদ করলেই হয় ‘মুহাম্মাদ’ ।

এই ‘নরাশংস’ শব্দটি ঋগ্বেদে ১৬ বার, যজুর্বেদে ১০ বার, অথর্ববেদে ৪ বার এবং সামবেদে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে ।

অপরদিকে শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে আছে,

‘‘অজ্ঞান হেতু ক্রেত মোহমদ অন্ধকার নাশম্
বিধায়েম হি তদু দেতে বিবেকা ।’’

অর্থাৎ- যখন অসংখ্য ব্যাক্তি সামগ্রিক কল্যানের উদ্ভবে মানুষের সত্য সন্ধিৎসা অর্জিত হবে তখন মুহাম্মদের মাধ্যমে অন্ধকার দুর হয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যাতি আবির্ভূত হবে ।

'ভবিষ্য পুরানে' আছে, "সেই সময় মুহাম্মাদ নামক পবিত্র ম্লেচ্ছ সপার্ষদ আসবেন । ...... রাজা ভোজ তাঁদের বলবেন-'হে মরুভূমির বাসিন্দা, শয়তানকে পরাস্তকারী, অলৌকিইতার মালিক, মন্দ থেকে পবিত্র, সত্য অবহিত এবং খোদার প্রেম ও গোপন তত্ত্বের প্রতিমুর্তি তোমাকে নমস্কার । তুমি আমাকে তোমার স্মরণাগত দাস ভাবো ।' রাজা ভোজের কাছে রক্ষিত পাথরের মূর্তির জন্য মুহাম্মদ বলবেন যে সে তো আমার এঁটো খেতে পারে । এ কথা বলে রাজা ভোজকে এরুপই অলৌকিকতা দেখাবেন । একথা শুনে ও দেখে রাজা ভোজ অত্যান্ত তাজ্জব হয়ে যাবে । আর ম্লেচ্ছধর্মে তার প্রতীতি জন্মাবে ।" (ভবিষ্য পুরাণ, খন্ড-৩, তৃতীয় অধ্যায়, প্রতিশত পর্ব, ৫-১৬ সংখ্যক শ্লোক)

(From the Bhavishwa Purana, Creation, part 3, chapter 3)

Muhammad has been described as the last Messenger of God in the Puranas. Muhammad appeared during the reign of king Bhoja. Seeing a world-wide decline of religion, King Bhoja went to Arabia.

There he met a Mlechcha Master called Muhammad, whom he found surrounded by his companions. The King washed the great Sage of the desert with water from the Ganges [perhaps meaning holy water]; anointed him with sandal-wood paste mixed with the five products of the cow (viz. milk, coagulated milk, butter, liquid and solid excreta); and thereby pleased Lord Shiva. In paying his obeisance he said, " 'O' Master of the desert, destroyer of the monsters, versed in the highest knowledge, protected by the Mlechchas, pure and true, embodiment of conscious and joyful beneficence, mysalutations to you! Accept me, one whose plase is under your feet, as your slave!"-Verses 15-17)

King Bhoja had an idol with him made of stone. When Muhammad saw that, he said, "one whom you worship, eats my left-overs." Saying this, he did indeed feed the idol with his left-overs.

When he heard and saw this, King Bhoja was bewildered. He then accepted the Mlechcha religion. Verses 15-17.

During the night, Angel appeared in the garb of a demon, and addressed King Bhoja, " 'O' King! Even though your religion is the best of all religions, from now on, I will name it as a demonic religion, by the command of God. From now on, the one who has got his foreskin removed, who does not wear a tiki, who is bearded, and who invites loudly (i.e. gives Azaan to call to prayers), will be dear to me. He will eat of clean animals. He will rid all religions of their superstitions. This will be my religion." Having said this, the Angel disappeared.- Verses 23-28.

The word Ahmad is so exalted that it has been used in the Rigveda (8:6:10), in the Atharvaveda (20:11:1), in the Samveda (verse 152 and 1500) and in the Bhaviswa Purana, Creation, part 3, chapter 4.

In addition to that, the word Allah has been used in the Rigveda. (9:67:30 and 3:30:10).

ভবিষ্যপুরানে আছে,

"লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষকঃ ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জমোমম ।।২৫
বিনা কৌলংচ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম ।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ।। ২৬
তস্মানুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্ম্ম দূষকাঃ ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ ।।২৭"

(ভবিষ্য পুরাণ, শ্লোক ঃ ১০-১৭)

অর্থাৎ আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বকছেদন (খতনা) করবে । সে টিকিহীন ও দাড়ি বিশিষ্ট হবে; সে এক বিপ্লব আনবে । সে উচ্চস্বরে ধ্বনি (আজান) করবে । সে সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য (হালাল দ্রব্য) ভক্ষণ করবে; সে শূকর মাংস আহার করবে

না । সে তৃণলতা দ্বারা পূত পবিত্র হবে । ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে । আমার দ্বারা এই মাংসহারীদের ধর্ম স্থাপিত হবে ।

সামবেদে আছে,

"মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা ।
বৃষনাং বক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচস্মৃতা ।"

অর্থাৎ যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ আক্ষর 'দ' এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করবেন, তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি । (The devota whose name starts a 'ma' and ends with a 'Da' and who re-estabishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.)

আর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নামের প্রথম অক্ষর 'ম' ও শেষ অক্ষরে 'দ' রয়েছে । তিনিও গরুর মাংস ভক্ষণ করাকে সর্বকালের জন্য বৈধ ঘোষনা করেছেন । সুতরাং সামবেদর যে ঋষির কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে আরও বলে হয়েছে,

লা ইলহা হরতি পাপম
ইল্ল ইলহা পরম পব্দম
জন্ম বৈকুণ্ঠ পর অপ ইনতিত
জপি নাম মুহাম্মাদম ।
(উত্তরায়ন বেদ, অনকহি পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অধ্যায়)

অর্থাৎ 'লা ইলহা' বললে সব পাপ মাফ হয়ে যায় । 'ইল্লাল্লা' বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হওয়া যায় । যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মোহম্মাদের নাম জপ কর ।

ইসলামের মতো বেদে আরও বলা হয়েছে, "হোতার মিন্দ্রো, হোতার মিন্দ্রো, মহাসুরিন্দ্রা অল্ল জ্যেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠং পরমপূর্ণ ব্রম্ভনং অল্লাম, আল্লহ রসল্ল মুহাম্মাদরং কং বরস্য অল্ল অল্লাম, আব্দুল্লাহ বুক মেকং আল্লাহ নির্মাত কম ।"

অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব আছে । আমার অস্তিত্ব আছে । আমি আল্লাহ জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পরমপূর্ণ ব্রম্ভা । আমি আল্লাহ । আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদের তুল্য আর কে আছে ? আমি আল্লাহ সহ অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু । (অথর্ববেদ : উপনিষদ অল্লপ নিয়ম পরিচ্ছেদ)

ALLOPANISHAT.

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते । इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्द्दुः । हयामित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्काम: ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्रा: । अल्लोज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥२॥ अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आदल्लाबूकमेककम् ॥ अल्लाबूक निखातकम् ॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अल्ला सूर्य्य चन्द्र सर्व नक्षत्रा: ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सर्व दिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षा: ॥ ६ ॥ अल्ल: पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लां कबर इल्लां कबर इल्लां इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥ ८ ॥ ओम् अल्लाइल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणा श्यामा हुं ह्रीं जनान् पशूनसिद्धान् जलचरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुर संहारिणी हुं ह्रीं अल्लोरसूल महमदरकबरस्य अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥ १० ॥

''अथाल्लोपनिषद्र व्याख्यास्याम:।

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि भत्ते।

इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्ईदु:।

हमा मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्काम:।।1।।

होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्रा:।

अल्लो ज्येष्ठं परमं पूर्ण ब्राह्मणं अल्लाम्।।2।।

अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम्।।3।।

आदल्लाबूकमेककम्। अल्लाबूक निखातकम्।।4।।

अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा। अल्ला सूर्य्यचन्द्रसर्वनक्षत्रा:।।5।।

अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षा:।।6।।

अल्ल: पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम्।।7।।

इल्लां कबर इल्लां कबर इल्लां इल्लल्लेति इल्लल्ला:।।8।।

ओम् अल्लाइल्लल्ला अनादिस्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हुं ह्रीं जनानपशूनसिद्धान्

जलचरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट्।।9।।

असुरसंहारिणि हुं ह्रीं अल्लोरसूलमहमदरकबरस्य अल्लो अल्लाम् इल्लल्लेति

इल्लल्ला:।।10।।

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता।।

বেদের সারাংশ উপনিষদে আছে, "আল্লহ রসল্ল মুহাম্মাদ কং বরস্য" অর্থাৎ আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ তোমাদের বরনীয় ।

এই গেল হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী । এখন দেখি খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

সম্পর্কে কি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । বাইবেলে হযরত ঈশা (আঃ) আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী করেছেন । হযরত ঈশা (আঃ) বলেছেন,

"I will pray the Father and he shall give you another Comforter that he may abide with you for ever." (John 14-10)

অর্থাৎ আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন 'শান্তিদাতা' প্রেরণ করবেন । তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারেন ।

"It is expedient for you that I go away I go not away the comforter will not come unto you," (John 19-7)

অর্থাৎ আমার উচিৎ যে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই 'শান্তিদাতা' আসবেন না ।

"When he is come he will reprove the world of sin, and of rightousness and of Judgement." (John 16-8)

অর্থাৎ এবং তিনি এসে বিশ্বজগৎকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।

"I have yet many things to say unto you, But ye cannot bear them now." (John 16-12)

অর্থাৎ এখন তোমাদের কাছে আমার বহু কথা বলার ছিল কিন্তু তোমরা সে সব এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না ।

"Howbeit when he, the sprit of truth is come, he will guide you into all truth for shall not ypeak of himself, But what saver he shall, heat that shall he Speak and he will shew you things to come." (John 16-13)

অর্থাৎ যাইহোক সেই সত্য আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি পূর্ন সত্যের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন । কারণ তিনি নিজের তরফ হতে কিছুই বলবেন না । তিনি যা বলবেন প্রভূর নিকট হতে শুনেই বলবেন । আর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার নমুনাও তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন ।

কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

সংস্কৃত ভাষায় প্রখ্যাত জ্ঞানী ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর একটি প্রচারপত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কল্কি অবতার বলেছেন । কল্কি এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বৈশিষ্টকে তুলনামূলক অধ্যায়ন করে ড. উপাধ্যায় এটা প্রমাণ করেছেন যে কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । সেই প্রচারপত্রের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

“বৈজ্ঞানিক আনবিক বিস্ফোরণের দ্বারা বিশ্বের যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে তা তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ একমাত্র ধর্মীয় একতার দ্বারাই সম্ভব । জলে বসবাস করে কুমিরের সাথে শত্রুতা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । সেজন্য আমি ধর্মীয় আধারকে গ্রহণ করেছি । রাষ্ট্রীয় একতার প্রচারকগণ নিশ্চয় এতে কোন আপত্তি করবেন না । একমাত্র কূপমণ্ডক সংকীর্নমনা হীন চরিত্রের ব্যক্তি আপত্তি করতে পারে ।”...... “আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আমার এই গ্রন্থ অধ্যায়ন করার ফলে সর্বভারতীয় সমাজ তথা লিখিল বিশ্বে সার্বিক একতা গড়ে উঠবে এবং ধর্মীয় কলহ ও দ্বন্দ দূরীভূত হবে ।”

এখানে সেই প্রচারপত্রের কিছু বিশেষ অংশ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সেই সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেশ করা হচ্ছে ।

অবতার শব্দের অর্থ

‘অবতার’ শব্দ ‘অব’ এর ‘তৃ’ ধাতুতে ঘঅ প্রত্যয় যোগ করে উৎপন্ন হয়েছে । অবতার শব্দের অর্থ হল পৃথিবীতে আগমন । ‘ঈশ্বরের অবতার’ শব্দের অর্থ হল সকলকে ঐশ্বী প্রত্যদেশ সম্পর্কে জ্ঞান দানকারী এমন মহান ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন । কল্কি অবতারকে ঈশ্বরের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে । ‘ঈশ্বরের অবতার’ শব্দে ‘এর’ শব্দ সম্বন্ধসূচক চিহ্ন । অতএব এটা

প্রকাশ্য যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির পৃথিবীতে অবতীর্ন হওয়া। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কারা ? তার ভক্তের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে। ঋগ্বেদের মধ্যে এইরকম ব্যক্তিকে 'কীরি' বলা হয়েছে। বাংলায় এবং হিন্দীতে 'কীরি' শব্দের অর্থ হল 'ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত' এবং এর আরবী অনুবাদ হল 'আহমদ'। কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসিত 'কীরি' বা 'আহমদ' কি একটাই শব্দ নয়। প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতার এসেছেন কিন্তু একটি মাত্র অবতার দ্বারা সারা বিশ্বের কল্যান সম্ভব হতে পারে না। কুরআন শরীফে আছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল বা অবতার পাঠানো হয়েছে। তবে অন্তিম অবতার কল্কির মধ্যে আলাদা বিশেষন রয়েছে। তিনি পৃথিবীর কোন একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

যখন মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে অধর্মের দিকে চালিত হয় বা ধর্মকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী বিকৃত করে দেয় তখন মানুষকে পুনরায় সঠিক পথ দেখাবার জন্য ঈশ্বর অবতার বা পয়গম্বর প্রেরণ করেন।

অন্তিম অবতারের লক্ষণ

কল্কি অবতারের আগমনের সময় সেই সময়কে বলা হয়েছে যখন বর্বরতার সাম্রাজ্য হবে। লোকেদের মধ্যে হিংসা এবং অরাজকতা বিরাজ করবে। গাছের মধ্যে কোন ফল বা ফুল থাকবে না। যদি ফল ফুল হয়েও থাকে তবে খুব কম হবে। মানুষকে খুন করে তাদের সম্পত্তি লুন্ঠন করা হবে এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। এক ঈশ্বরকে ছেড়ে বহু দেব দেবীর উপাসনা করা হবে। গাছপালাকে ভগবান মানার প্রবৃত্তি মানুষের মনে তৈরী হবে, ভালো কাজের আড়ালে খারাপ কাজ করার প্রবৃত্তি তৈরী হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদিতে ভরে যাবে। ঠিক সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে রোমান এবং পারসীয়ান সাম্রাজ্যের যে জঘন্য পরিস্থিতি ছিল এত খারাপ পরিস্থিতি আর কখনো ছিল না। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে শাসন ব্যাবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাদ্রীদের দুষ্কর্মের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পড়েছিল। পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং শত্রুতার জন্য পরিস্থিতি একেবারে ক্ষীন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ থেকে অনেক দুরে ছিল। এই ধর্মের ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল যে তুফানের গতিতে সারা পৃথিবীতে

সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দী বহু সাম্রজ্যকে, শাসকদিগকে এবং সামাজিক কুপ্রথাকে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে ঝঞ্ঝা যেরকম মাটিকে উড়িয়ে দেয় । এই কথা সেল সাহেব কুরআন শরীফের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, “গির্জার পাদ্রীরা ধর্মকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রকার শান্তি প্রেম এবং যা কিছু ভাল ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । লোকেরা মূল ধর্ম ভূলে গিয়েছিল ।

ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেরাই বিভিন্ন বিচারধারা তৈরী করে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত ছিল । এই ধরাপৃষ্ঠে রোমান গির্জাঘরের মধ্যে ধর্মের নামে ভ্রান্ত মতবাদ প্রসারিত হতে শুরু হয় এবং নির্লজ্যভাবে মূর্তীপুজা করা হয় ।” এর ফলস্বরুপ একটি ঈশ্বরের স্থানে তিনজন ঈশ্বরের পুজা শুরু হয় এবং হযরত মরিয়ম (আঃ) ঈশ্বরের মা বলে মনে করা হয় । অজ্ঞতার এই সময়ে আল্লাহ নিজের অন্তিম রসুল (অবতার) প্রেরণ করেন ।

এখানে দ্বিতীয় কথা হল, অন্তিম অবতার সেই সময় আসবেন যখন যুদ্ধের সময় তরবারির ব্যাবহার করা হয় এবং ঘোড়ার উপর যাতায়াত হবে । ভগবত পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘দেবতার দ্বারা প্রদত্ত দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে আটটি ঐশ্বর্যে এবং পরিপূর্ণ সেই জগৎপতি দুষ্টদেরকে দমন করবেন ।’ তরবারি এবং ঘোড়ার যুগ তো এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে । আজ থেকে প্রায় চোদ্দশত বছর আগে ঘোড়া এবং তরবারীর ব্যবহার করা হত । এর একশত বছর পর বারুদের নির্মান সোডা এবং কয়ালার সংমিশ্রনে হয় । বর্তমান যুগে ঘোড়া এবং তরবারীর জায়গায় টেঙ্ক এবং মিশাইল ব্যাবহার করা হয় ।

কল্কি অবতারের স্থান

কল্কি পুরাণ এবং ভগবত পুরাণে কল্কি অবতারের জন্মস্থান শম্ভল নামক গ্রামে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে প্রথমে এটা নিশ্চিত করা উচিৎ যে শম্ভল কোন গ্রমের নাম না কোন গ্রামের বৈশিষ্ট । ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী ‘শম্ভল’ কোন গ্রামের নাম হতে পারে না, কেননা যদি শম্ভল কোন গ্রামের নাম হত তাহলে তার সেই গ্রামের অবস্থান সম্পর্কেও বলা হত । ভারতে খোঁজাখুজির পর যদি শম্ভল নামক কোন গ্রামের নাম পাওয়াও যায় তাহলে সেখানে প্রায় পনেরোশত বছর আগে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি যনি মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ন হয়েছেন । তাহলে অন্তিম অবতার তো কোন খেলার বস্তু নয় যে তিনি অবতারিত হবেন এবং সমাজে কোন পরিবর্তন হবে না, অতএব শম্ভল শব্দের বৈশিষ্ট মেনে নিয়ে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিচার করা প্রয়োজনীয়,

১) ‘শম্ভল’ শব্দ ‘শন’ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ যে স্থানে শান্তি লাভ হয় ।

২) সম্ উপসর্গ পৃথক ‘ব’ ধাতুতে অপ্ প্রত্যয় যোগ করে ‘সংবর’ হয়েছে । ‘অবয়োর ভেদঃ’ এবং ‘য়লযোর ভেদঃ’ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শম্ভল উৎপন্ন হয়েছে । যার অর্থ হল - ‘যা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে অথবা যার দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করা হয় ।’

৩) নির্ঘন্টের (১/১২/৮৮) উদকনামা অধ্যায়ে ‘শম্ভর’ শব্দ লেখা আছে । ‘র’ এবং ‘ল’ এর মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য না থাকার জন্য ‘শম্ভল’ এর অর্থ হবে - জলের সমীপবর্তী স্থান ।

ঠিক সেই রকম সেই স্থানের আসেপাশে জল থাকবে এবং সেই স্থান অত্যন্ত আকর্ষিত এবং শান্তিদায় হবে, সেই জায়গাটাই হল সম্ভল । অবতারের স্থান পবিত্র হয় । ‘শম্ভল’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল - শান্তির জায়গা । মক্কাকে আরবীতে ‘দারুল আমান’ বলা হয়, যার অর্থ হল শান্তির ঘর । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কর্মস্থল ছিল মক্কা ।

জন্ম তিথি

কল্কি পুরাণে অন্তিম অবতারের জন্মের উল্লেখও করা হয়েছে । সেই পুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫ নং শ্লোকে আছে,

“দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য, মাধবে মাসি মাধবম্ ।
জাতো দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ ।।”

অর্থাৎ “যার জন্ম নেওয়ার ফলে দুখী মানবজাতির কল্যান হবে, তার জন্ম হবে বসন্ত কালের শুক্লপক্ষে এবং রবিশয্যের সময়ে চাঁদের ১২ তারিখে ।”

অন্য একটি শ্লোকে আছে, কল্কি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক পুরোহিতের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করবেন । পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মও ১২ রবিউল আওয়াল হয়েছিল । রবিউল আওয়াল শব্দের অর্থ হল ঃ মাধব মাস বা বসন্ত কাল । তিনি মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন । কল্কি অবতারের পিতার নাম বিষ্ণুযশ

বলা হয়েছে, আর হযরত মুহাম্মাদের পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ । বিষ্ণুযশ শব্দের যা অর্থ আব্দুল্লাহ শব্দেরও তাই অর্থ । বিষ্ণু মানে আল্লাহ এবং যশ মানে হল বান্দা = অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা = আব্দুল্লাহ ।

অনুরুপ কল্কি অবতারের মায়ের নাম বলা হয়েছে সুমতি, যার অর্থ হল ঃ শান্তি এবং মননশীল স্বভাবযুক্তা । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মায়ের নাম ছিল আমীনা, যার অর্থ হল ঃ শান্তিময়ী ।

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

১) অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী ঃ আগেই বলা হয়েছে যে ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি এমন ঘোড়ায় আরোহন করবেন যেটা খুব দ্রুতগামী হবে এবং তা দেবতা প্রদত্ত হবে । তরবারীর দ্বারা তিনি দুষ্টের দমন করবেন । ঘোড়ায় আরোহন করে তিনি দুষ্টের দমন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেও ফেরেস্তা দ্বারা ঘোড়া দান করা হয়েছিল, যার মান ছিল বুরাক । তাতে চড়ে অন্তিম রসুল রাত্রি বেলায় তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন । তাকে 'মিরাজ' বলা হয় । এই রাতি তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসেও (জেরুজালেম) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।

ঘোড়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রিয় জন্তু ছিল । তাঁরা কাছে সাতটি ঘোড়া ছিল । হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঘোড়ায় আরোহন করে গলায় তরবারী ঝুলানো অবস্থায় দেখেছি । তাঁর কাছে ৯ টি তরবারী ছিল । বংশ পরম্পরায় তিনি জুলফিকার, কালীয়া নামক তরবারী পেয়েছিলেন ।

২) দুষ্টের দমন ঃ কল্কি অবতারের মুখ্য বৈশিষ্টের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট হল যে তিনি দুষ্টকে দমন করবেন । ধর্মের প্রচার এবং দুষ্টকে দমন করার জন্য আকাশ থেকে দেবতাগণ অবতরণ করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দুষ্টদের দমন করেন । তিনি ডাকাত, লুন্ঠনকারী, এবং দুর্বৃত্তগণকে সংশোধন করে মানবতার শিক্ষা দান করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের সংশোধন করে সুন্দর সংস্কারে সমাজে থাকার উপযোগি বানান । একেশ্বরবাদের সাথে সাথে তিনি সমস্ত দেবতাদের তালগোল পাকানো ব্যবস্থাকে খন্ডন করেন এবং বলেন যে ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয় বরং এটা সনাতন ধর্ম । দুষ্টকে দমন করার সময় তাঁকে ফেরেস্তাদের দ্বারা সাহায্য করা হয় । কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ তোমাকে বদরের যুদ্ধে সহযোগিতা করেন এবং তোমরা সংখ্যায় খুব কম ছিলে, তাহলে তোমাদের উচিৎ যে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা । যখন তোমরা মোমেনদিগকে বলছিলে যে আল্লাহ যে তোমাদেরকে তিন হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? বরং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার বিশিষ্ট ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন ।

সুরা আহযাব এর মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঐশ্বরিক ভাবে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে । এই সুরার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর সেই কৃপাকে স্মরণ কর যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সেনা এসেছিল তখন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে আকাশপথে সেনা প্রেরণ করি, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি আর যা কিছু তোমরা করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন ।” এইভাবে দুষ্টকে নাশ করার জন্য ঈশ্বর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সাহায্য করার জন্য নিজের ফেরেস্তা এবং সেনা প্রেরণ করেন ।

৩) জগদপতি বা জগদগুরু ঃ পতি শব্দ ‘পা’ (রক্ষা করা) ধাতুর সাথে উতি প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হয়েছে । জগৎ শব্দের অর্থ হল ব্রম্ভান্ত । অতএব

জগদপতি শব্দের অর্থ হল সমগ্র ব্রম্ভান্ডের রক্ষাকারী । ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারকে জগদপতি বলা হয়েছে ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জগদপতি বা জগদগুরু ছিলেন, কেননা তিনি পতনশীল সমাজকে ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন । সেগুলোকে রক্ষা করেন

এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । কুরআন শরীফে আছে : “হে মুহাম্মাদ ঘোষনা করে দাও তুমি সমগ্র বিশ্ব জাহানের নবী ।” অন্য জায়গায় আছে : “অত্যন্ত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন যাতে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রম্ভান্ডকে পাপ থেকে ভীতি প্রদর্শ করতে পারেন ।”

৪) চারজন ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ঃ কল্কি পুরাণ অনুযায়ী চারজন ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কল্কি কলি (শয়তান) দমন করবেন ।

মুহাম্মাদ (সাঃ)ও চারজন সঙ্গীর সহযোগিতায় শয়তানকে দমন করেন । সেই চার সাথী যথাক্রমে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান গনী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ।

৫) অন্তিম অবতার ঃ কল্কিকে অন্তিম যুগের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে । মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ঘোষনা করেছিলেন যে আমি অন্তিম রসুল ।

‘বাচস্পত্যম’ এবং ‘শব্দকল্পতরু’ গ্রন্থে কল্কি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যে আনার বা ডালিম ফল ভক্ষণকারী এবং কলঙ্ক ধৌতকারী । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ডালিম বা খেজুর ফল খেতেন এবং তিনি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত অংশীবাদীতা (শির্ক) এবং নাস্তিকতা (কুফর)কে ধৌত করেন ।

৬) উপদেশ এবং উত্তর দিকে গমন ঃ কল্কি জন্মগ্রহণের পর পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন এবং সেখানে তিনি পরশুরামের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করবেন । পরে তিনি উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও জন্মের কিছু দিন পরে পাহাড়ে (হেরা গুহায়) চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করেন । তারপর তিনি উত্তরে মদীনা গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিন দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের স্থানকে জয় করেন । পুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে এই কথাই লেখা আছে ।

৭) আটটি গুনে গুণান্বিত ঃ কল্কি অবতারকে ভগবৎপুরাণের ১২ শ স্কন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে ‘অষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ’ (আটটি গুণে গুণান্বিত) বলা হয়েছে । এই আটটি ঈশ্বরীয় গুণ মহাভারতেও উল্লেখ করা হয়েছে, সেই গুণগুলি হল যথাক্রমে,

(ক) তিনি মহান জ্ঞানী হবেন ।
(খ) তিনি উচ্চ বংশীয় হবেন ।
(গ) তিনি ইন্দ্রিয় দমনকারী হবেন ।
(ঘ) তিনি শ্রুতিজ্ঞানী হবেন ।
(ঙ) তিনি পরাক্রমী হবেন ।
(চ) তিনি অল্পভাষী হবেন ।
(ছ) তিনি দানী হবেন ।
(জ) কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন ।

এখন আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই গুণগুলিকে নিয়ে যথাক্রমে আলোচনা করব । মুহাম্মাদ (সাঃ) মহান জ্ঞানী ছিলেন । তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা গভীর ছিল ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেন যা হুবহু সত্য বলে প্রমাণ হয় ।

আগেই বলা হয়েছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে রোমবাসীরা প্রথমে হেরে যাবে এবং পরে বিজয় লাভ করবে । তাঁর দুরদর্শীতার অনেক উদাহরণ রয়েছে যাতে তাঁর উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে বোঝা যায় ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন । তাঁর জন্ম কোরেশ বংশে বনু হাশিম পরিবারে হয়েছিল যাঁরা আরবদের নিকট সম্মানীয় এবং কাবার পরম্পরাগত ভাবে সংরক্ষক ছিলেন ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ইন্দ্রিয়দমনের ও আত্মনিয়ন্ত্রনের গুণও ঐশ্বরিকভাবে দেওয়া হয়েছিল । তিনি আত্মপ্রশংসা থেকে দুরে থাকতেন এবং তিনি দয়ালু, শান্ত, ইন্দ্রজীৎ এবং উদার ছিলেন ।

তিনি শ্রুতিজ্ঞানীও ছিলেন । শ্রুত এর অর্থ হল, ‘যিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান এবং ঋষিদের দ্বারা শুনতে পান ।’ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর জিব্রাইল নামক ফেরেস্তার মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদান করা হত । লেনপুল নিজের পুস্তক “Introduction; Speeches of Muhammad” এর মধ্যে লিখেছেন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) দেবদুতের সহযোগিতায় ঈশ্বরীয় বাণী প্রেরণ করার ঘটনা একেবারে নিঃসন্দেহে

সত্য । স্যর উইলিয়াম ম্যুরও লিখেছেন যে তিনি (মুহাম্মাদ) ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন ।

আটটি গুণের মধ্যে পঞ্চম গুণ হল পরাক্রমশীলতা । রসুলুল্লাহ (সাঃ) যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁর এই পরাক্রমশীলতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটা হল,

'কোরেশ বংশীয় রুকানা পালোয়ান একটি গুহার মধ্যে উপস্থিত ছিল । তাকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঈশ্বরকে ভয় না করার এবং তার উপর বিশ্বাস না করার কারণ জানতে চায়লেন । তখন পালোয়ান ঈশ্বরের সত্যতার ব্যাপারে জানতে চায়লেন । তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, তুমি বড় বীরপুরুষ, যদি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি তাহলে তুমি (আল্লাহকে) বিশ্বাস করবে ? রুকানা তাতে রাজী হয়ে গেল । তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে হারিয়ে দিলেন । (আল্লামা কাজী সালমান মনসুরপুরী তাঁর নবীর জীবনী গ্রন্থ 'রহমাতুল্লিল আলামিন' এর মধ্যে 'শিফা' নামক পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রুকানাকে তিনবার পরাস্ত করেন, তবুও রুকানা পালোয়ান হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে পয়গম্বর বলে মানেনি এবং ঈশ্বরকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি ।

আটটি গুণের মধ্যে অল্পভাষীও হল একটি গুণ । আল্লাহর রসুল (সাঃ) কম কথা বলতেন । অধিক সময় তিনি চুপ থাকতেন কিন্তু তিনি যা বলতেন তা এতই প্রভাবশালী ছিল যে লোকেরা তা কখনো ভূলত না ।

দান করা মহাপুরুষের একটি অন্যতম মহান গুণ । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দানকার্য থেকে কখনো পিছু হাটতেন না । সেইজন্য তাঁর ঘরে গরীব লোকের ভীড় লেগেই থাকতো । তাঁর ঘর থেকে কেও কখনো নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণের মধ্যে কৃতজ্ঞতাসম্পন্নও একটি মহান গুণ ছিল । তিনি কারো উপকার কখনো ভূলতেন না । আনসারদের প্রতি তাঁর বাণী কৃতজ্ঞতা সম্পন্নতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সুতরাং এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে ঐশ্বরিক আটটি গুণ ছিল ।

৮) শরীর থেকে সুগন্ধী বের হওয়া ঃ ভগবৎপুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে কল্কি অবতারের শরীরে এমন সুগন্ধী বের হবে যাতে লোকেরা মোহিত

হয়ে যাবে । তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধী বের হয়ে লোকেদের মনকে নির্মল করে দেবে । শামায়েলে তিরমিযী নাম গ্রন্থে লেখা আছে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীরে খুশবু বের হওয়াটাতো প্রসিদ্ধ বটেই বরং মুহাম্মাদ (সাঃ) যাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেন তার হাত থেকেও সারাদিন সুগন্ধী বের হত ।

একবার হযরত উম্মে সুলৈত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীরের ঘামকে জমা করেন । নবী (সাঃ) এর জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমরা এই ঘামকে সুগন্ধীর সঙ্গে মিশ্রন করে দিই কেননা এই ঘাম সমস্ত সুগন্ধীদ্রব্যের থেকেও উত্তম ।

৯) অনুপম এবং কান্তিময় হওয়া ঃ কল্কি অবতার অনুপম এবং কান্তিময় হবেন । বুখারী শরীফের হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সাঃ) সমস্ত ব্যাক্তিদের থেকেও সুন্দর ছিলেন এবং সকলের থেকে অধিক মার্যাদাবান এবং যোদ্ধা ছিলেন । স্যর উইলিয়াম ম্যুরও মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অতি রুপবান, পরাক্রমী এবং দানী বলেছেন ।

১০) ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া ঃ ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ‘কল্কি অবতার আউর মুহাম্মাদ সাহব’ এর ৫০, ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘কল্কির ব্যাপারে ভারতে একথা প্রসিদ্ধ যে তিনি যে ধর্ম স্থাপন করবেন সেটা হবে বৈদিক ধর্ম এবং তাঁর দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা হবে ঐশ্বরি শিক্ষা । মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতারিত কুরআন হল ঐশ্বরিক বাণী, এটা তো সকলের কাছে স্পষ্ট, যদিও হঠকারী লোক তা মানে না । কুরআনে যে নীতি, সদাচার, প্রেম, উপকারীতা ইত্যাদির ব্যাপারে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে তা বেদের মধ্যেও রয়েছে । কুরআন শরীফে মূর্তী পুজার খন্ডন করা হয়েছে, একেশ্বরবাদের (তওহীদ) শিক্ষা, পরস্পরের প্রতি প্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । বেদের মধ্যে ‘একম্ সত’ বা বিশ্ববন্ধুত্বের ঘোষনা করা হয়েছে । বেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনের শিক্ষা দ্বারা মুসলমান দিনে পাঁচবার নামায পড়া বাধ্যতামূলক পক্ষান্তরে ব্রাম্ভনবর্গের বিরলে লোকেরাই ত্রিকাল সান্ধ কারীরা মিলিত হবে ।

এখানে এই কথা অবশ্যই বলা উচিৎ যে বেদ এবং কুরআনের শিক্ষার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে । উদাহরণস্বরুপ, বেদ, গীতা, এবং স্মৃতি গ্রন্থে এক ঈশ্বরের ভক্তির আদেশ করা হয়েছে এবং নিজের খারাপ কাজের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যও সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে । কুরআনে আছে, ঃ “হে নবী ! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ । আমার প্রতি

ওহি করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ । অতএব তুমি তাঁরই পথ দৃঢভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।” ড. উপাধ্যায় বলেছেন যে কল্কি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে যে অভুতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি পেয়েছি তা দেখে তা দেখে আশ্চর্য হই যে যে কল্কির প্রতিক্ষায় ভারতীয়রা বসে আছে, তিনি চলে এসেছেন এবং তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাহব ।

উপনিষদেও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিবরণ

উপনিষদের মধ্যেও মুহাম্মাদ সাহেবের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায় । নাগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সম্পাদিত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খন্ডে উপনিষদের সেইসব শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কিত রয়েছে । এর মধ্যে কিছু মুখ্য শ্লোক এবং তার অর্থ নিচে দেওয়া হল যাতে পাঠক এর বাস্তবতা বুঝতে পারেন ।

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্ত ।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দুদঃ ।
হয়ামিত্রৌ ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণৌ মিত্রস্তেজস্কামঃ ।।১।।
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্টং পরমং পূর্ণ ব্রাম্ভণং অল্লাং ।।২।।
অল্লো রসুল মহামদ রকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ।।৩।।
(অল্লোপনিষদ, ১,২,৩)

অর্থাৎ “এই উপাস্যের নাম আল্লাহ । তিনি এক । মিত্র, বরুণ হল তার বিশেষন । বাস্তবে আল্লাহই হলেন বরুন তিনি সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ । বন্ধুগণ ! সেই আল্লাহকেই নিজের উপস্য মনে করো । তিনিই বরুণ এবং একজন বন্ধুর মতো সমস্ত লোকের কাজ করান । তিনিই ইন্দ্র, শ্রেষ্ট ইন্দ্র । আল্লাহ সবার থেকে বড়, সবথেকে উত্তম, সবথেকে পূর্ণ এবং সবথেকে বেশী পবিত্র । মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ট রসুল । আল্লাহ আদি অন্ত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা । সমস্ত ভাল কাজ আল্লাহর জন্যই । বাস্তবে আল্লাহই সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন ।”

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা এটা নির্বিচিত্রে স্পষ্ট যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন এক এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক (পয়গম্বর) । এই উপনিষদের

অন্য শ্লোকেও ইসলাম এবং পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে,

আদল্লা বুক মেককম্। অল্লবুক নিখাদকম্ ।।৪।।
অলো যজ্ঞেন হুত হুত্বা অল্লা সূর্য চন্দ্র সর্বনক্ষত্রা ঃ ।।৫।।
অল্লো ঋষিনাং সর্ব দিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব মায়া পরমন্তরিক্ষা ।।৬।।
অল্লহঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরুপম্ ।।৭।।
ইল্লাংকবর ইল্লাংকবর ইল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ।।৮।।
ঔম্ অল্লা ইল্লল্লা অনাদি স্বরুপায় অথর্বণ শ্যামা হুহ্রি জনান পশূন সিদ্ধান জলবারন্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট ।।৯।।
অসুরসংহারিণী হৃং হ্রিং অল্লো রসুল মহমদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ।।১০।।

(অল্লোউনিষদ)

অর্থাৎ "আল্লাহ সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং চন্দ্রমা, সূর্য এবং তারাকে সৃষ্টি করেন। তিনিই সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ব্রম্ভান্ড (জমীন এবং আকাশ) সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ শ্রেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হে পুজারী ! তুমি বলে দাও, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ অনাদি। তিনি সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা। মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল (বার্তাবাহক), যিনি এই বিশ্বের পালনকর্তা। অতএব ঘোষনা করে দাও আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হন। 'বুদ্ধ' বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় ঋষিকে বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয় শিষ্য আনন্দাকে বলেন, "হে নন্দা ! এই বিশ্বে আমি প্রথম বুদ্ধও নই এবং অন্তিম বুদ্ধও নই। এই জগৎকে সত্য এবং পরোপকারের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি সময়ে একজন অন্তিম বুদ্ধের আগমন হবে। তিনি পবিত্র অন্তকরণের অধীকারী হবেন। তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হবে। জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকেদের নায়ক হবেন। যেরকম আমি বিশ্বকে অনশ্বর সত্যের শিক্ষা দিয়েছি ঠিক সেই রকম তিনিও বিশ্বকে সত্যের শিক্ষা

দান করবেন । বিশ্বকে তিনি এবং জীবনদর্শনের শিক্ষা দান করবেন যা শুদ্ধ এবং পূর্ণ হবে । হে নন্দা ! তাঁর নাম হবে মৈত্রেয় ।” ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ হল, ‘বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত’ । বুদ্ধ মানবজাতিরই হন, দেবতা হননা । মৈত্রেয় শব্দের অর্থ হল, ‘দয়া দ্বারা যুক্ত’ ।

মৈত্রেয়র সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সামঞ্জস্যতা

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র মধ্যে বুদ্ধে সমস্ত বৈশিষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক । বুদ্ধের মুখ্য বৈশিষ্টগুলি হল,

১) তাঁরা ঐশ্বর্যশালী এবং ধনশালী হবেন ।
২) তাঁরা সন্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন ।
৩) তাঁরা স্ত্রী এবং শাসনকার্যে যুক্ত থাকবেন ।
৪) তাঁরা নিজের পূর্ণ আয়ুকাল বাঁচবেন ।
৫) তাঁরা নিজের কাজ স্বয়ং করবেন ।
৬) বুদ্ধরা কেবল ধর্মপ্রচারক হবেন ।
৭) যে সময় বুদ্ধ একাকী থাকেন সেই সময় ঈশ্বর তাঁর সাথীদের রুপে দেবতা এবং রাক্ষস প্রেরণ করেন ।
৮) বিশ্বে একই সময়ে কেবল একজন বুদ্ধই থাকেন ।
৯) বুদ্ধের অনুসারীরা খাঁটি হয় । যাঁদেরকে কেউ তাঁদের পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ।
১০) কোন ব্যাক্তি তাঁর গুরু হবেন না ।
১১) প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের আগের বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং নিজের অনুসারীদেরকে ‘মার’ থেকে বাঁচাবার জন্য সাবধান করেন । মারের অর্থ হল, খারাপ কাজ এবং বিনাশ প্রসারণকারী । তাঁকে শয়তান বলা হয় ।
১২) অন্যান্য পুরুষের তুলনায় বুদ্ধের গর্দানের হাড় বেশি দৃঢ় হয়, যাতে তিনি ঘাড় ঘোরাবার সময় নিজের পুরো শরীরকে হাতির মতো ঘুরিয়ে নেন ।

এছাড়াও অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র অন্য বৈশিষ্ট রয়েছে । মৈত্রেয় দয়াবান হন এবং তাঁকে বোধী বৃক্ষের নীচে সভার আয়োজনকারীও বলা হয়েছে । এই বৃক্ষের নীচে বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তি হয় ।

ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে এই সব বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবনের সঙ্গে মিলে যায় অর্থাৎ অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । ড. উপাধ্যায় দ্বারা এই বিষয়ে প্রস্তুত করা তথ্য হুবহু নীচে বর্ণনা করা হল,

কুরআন শরীফে মুহাম্মাদ সাহেবকে ঐশ্বর্যবান এবং ধনবান হওয়ার ব্যাপারে ঐশ্বীবাণী রয়েছে যে, 'তুমি প্রথমে নির্ধন ছিলে, পরে তোমাকে ধনী (সম্পদশালী) করা হয়েছ ।' মুহাম্মাদ সাহেব ঋষি পদের প্রাপ্তির বহু আগেই ধনী হয়ে গিয়েছিলেন । মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট প্রচুর ঘোড়া ছিল । তাঁর যানবাহনের জন্য 'আলকাসবা' নামক প্রসিদ্ধ উঁটনী ছিল যার উপর চড়ে তিনি মদীনা গিয়েছিলেন এবং কুড়িটি উঁটনী তাঁর ছিল । এই উঁটের দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের পান করার জন্য যথেষ্ট ছিল, এই সঙ্গে তাঁর অতিথীদের জন্যও সেই দুধ যথেষ্ট ছিল । উঁটনীর দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের জন্য মুখ্য আহার ছিল । মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট সাতটি ছাগল ছিল, যা দুধের মূল উৎস ছিল । মুহাম্মাদ সাহেব দুধের জন্য মোষ রাখতেন না, এর কারণ হল যে আরবে মোষ পালন হয় না । তাঁর সাতটি বাগানের খেজুর ছিল যা পরবর্তীকালে ধর্মীয় কাজের জন্য মুহাম্মাদ সাহেব দান করে দিয়েছিলেন ।

মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট তিনটি ভূমিগত সম্পত্তি ছিল যার অংশ ছিল কয়েক বিঘে জুড়ে । মুহাম্মাদ সাহেবর অধীনে বেশ কয়েকটি কুঁয়াও ছিল । এটা অবশ্যই স্মরনীয় যে আরবে কারো নিকট কুঁয়া থাকাকে বিশাল সম্পত্তির মালিক বলে গন্য করা হত । কেননা সেখানে মরুভূমির সংখ্যা বেশী । মুহাম্মাদ সাহেবের ১২ জন স্ত্রী, চার কন্যা এবং তিনটি পুত্রসন্তান ছিল । বুদ্ধের নিকট স্ত্রী এবং সন্তান থাকাটি হল দ্বিতীয় গুণ । মুহাম্মাদ সাহেবের আগে ভারতে বুদ্ধদের মধ্যে এই গুণ মানমাত্র পাওয়া যেত, কিন্তু মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট সেই গুণ ১২ গুণ বেশী ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেব দেশ শাসনও করেছিলেন । তিনি জীবিতকালেই বড় বড় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তাদের উপর প্রভূত্ব কায়েম করেন । আরবের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগের মতো জীবনযাপন করতেন ।

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের পূর্ণ আয়ুস্কাল জীবিত ছিলেন । ক্ষণস্থায়ী তিনি জীবনযাপন করেন নি এবং তিনি কারো দ্বারা নিহতও হননি ।

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের কাজ স্বয়ং করতেন । তিনি সারা জীবন ধর্ম প্রচার করেন । তাঁর ধর্ম প্রচারের স্বরুপের উদ্ঘাটন অনেক ঐতিহাসিকরাও করেছেন ।

মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর পূর্ববর্তী ঋষিদের সমর্থন করেন, এই ব্যাপারে আপনারা পুরো কুরআনে লক্ষ্য করতে পারেন । উদাহরণস্বরুপ কুরআনে দ্বিতীয় সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

“হে ধর্মবিশ্বাসীগণ ! (মুসলমানগণ) তোমরা বল যে আমরা আল্লাহর উপর পুরো বিশ্বাস রাখি এবং যে গ্রন্থ আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা কিছু ইব্রাহীম, ইসমাইল এবং ইয়াকুবের উপর এবং তাঁর সন্তানদের (ঋষি) উপর এবং যা কিছু মুসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ)কে দেওয়া হয়েছে তার উপরও এবং যা কিছু অন্যান্য ঋষিদেরকে (গয়গম্বর) তাঁদের পালনকর্তার তরফ থেকে উপলব্ধি করানো হয়েছে, তার উপর আমরা বিশ্বাস স্থপন করছি এবং সেই ঋষিদের মধ্যে কোন রকমের কমবেশী মনে করি না এবং আমরা সেই একজন ঈশ্বরকে মান্যকারী ।”

মুহাম্মাদ সাহেব তাঁর অনুসারীদিগকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বার বার সাবধান করেছেন । কুরআনে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে যে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিভ্রান্ত করে দেবে এবং নরকের কষ্টের পথের পথিক বানিয়ে দেবে ।

মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা কখনো মুহাম্মাদ সাহেবের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচলিত না হয়ে তাঁর খাঁটি শিষ্য অথবা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন । মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা আজীবন তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি, তাতে তাঁদের যতোই কষ্টের সম্মুখীন হতে হোক । পৃথিবীতে যে সময় মুহাম্মদ সাহেব বুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় আর অন্য কেউ বুদ্ধ ছিলেন না । মুহাম্মাদ সাহেব বুদ্ধ হওয়ার সময় সমগ্র বিশ্বের সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেবের কোন গুরু পৃথিবীর কোন মানুষ ছিল না । মুহাম্মাদ সাহেব লেখা পড়া করেননি, সেজন্য তাঁকে ‘উম্মি’ বলা হয় । ঈশ্বর দ্বারা মুহাম্মাদ সাহেবের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ আয়াতের সমষ্টিই হল কুরআন । প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষ থাকা আবশ্যক । কোন বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষের জন্য অশ্বত্থ, কারো জন্য বটবৃক্ষ এবং কারো জন্য উদুম্বর (গুলর) গাছের ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে ।

বুদ্ধের জন্য যে বোধীবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে সেটা শক্ত এবং ভারি কাষ্ঠযুক্ত গাছের কথা বলা হয়েছে ।

হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট বোধীবৃক্ষরুপে হুদাইবিয়া নামক স্থানে একটি শক্ত ভার কাষ্ঠযুক্ত গাছ ছিল, যার নীচে মুহাম্মাদ (সাঃ) সভা করেছিলেন ।

'মৈত্রেয়' শব্দের অর্থ হল 'দয়া দ্বারা যুক্ত' । ১৬ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'লীডার' এর ৭ পৃষ্ঠায়, ৩ নং কলামে একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু 'মৈত্রেয়' শব্দের অর্থ 'দয়াবান' করেছেন । মুহাম্মাদ সাহেবও দয়ালু ছিলেন । সেজন্য মুহাম্মাদ সাহেবকে 'রহমাতুল্লিল আলামিন' বলা হয়েছে । যার অর্থ হল, 'সমগ্র মানবজাতির জন্য দয়াবান ।' ('নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি', পৃষ্ঠা-৫৪ থেকে ৫৮)

স্বর্গীয় বোধীবৃক্ষ বিস্তৃত ক্ষেত্রে রয়েছে । বলা হয়েছে যে বুদ্ধ স্থির দৃষ্টি দিয়ে বোধীবৃক্ষ দর্শন করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও জান্নাতে এক বৃক্ষকে দেখেছিলেন, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বিদ্যমান ছিল । সেই বৃক্ষটি এতো অংশ জুড়ে ছিল যা একজন ঘোড়সওয়ার একশত বছরেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও সেই স্বর্গীয় বৃক্ষটিকে চোখ জুড়ে দর্শন করেছিলেন ।

মৈত্রেয়র ব্যাপারে এও বলা হয়েছে যে কারো দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় তিনি নিজের শরীরের পুরোটাই ঘুরিয়ে দেন । পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর মিত্রদের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় নিজের পুরো শরীর ঘুরিয়ে নিতেন ।

এইভাবে এটাই প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধ গ্রন্থে যে মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ।

জৈন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

ড. পি. এইচ. চৌবে লিখেছেন, "আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)কে কল্কি অবতার বলে মানি । পুরাণে এই অবতারের (পয়গম্বর) ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে কল্কি অবতার বুদ্ধের অবতারের পরে আসবেন, যাঁর জন্ম শম্ভল নামক নগরে একজন পুজারীর পরিবারে হবে, তাঁর যান ঘোড়া এবং হাতিয়ার তরবারী হবে ।

তিনি সমগ্র পৃথিবীতে নিজের সত্য ধমর্র বিজয় আনবেন ।" (বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন কল্কি পুরাণ)

জৈন ধর্মের গ্রন্থকাররাও কল্কি অবতারের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর আগমনের সময়কাল মহাবীর স্বামী নির্বানের এক হাজার বছর পর হবে বলে মান্য করেছেন । মহাবীর স্বামীর নির্বানের বর্ষ প্রায় ৫৭১ খ্রীষ্ট পুর্বাব্দে বলে নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে । এইভাবে এক হাজার বছর পর কল্কি অবতারের আগমন হয় । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মকাল সেই বছরেই পড়ছে যা কল্কি অবতারের আগমনের সময়কাল । কল্কি অবতারের বৈশিষ্ট এবং তাঁর গুণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে । একজন প্রসিদ্ধ জৈন লেখক তাঁর গ্রন্থ হরিবংশ পুরাণের মধ্যে লিখেছেন মহাবীরের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে শক রাজার জন্ম হয় এর পর গুপ্তদের ২৩১ বছর শাসনের পর কল্কি অবতারের জন্ম হয় । এই ব্যাপারে শ্লোকটি হল,

"............গুপ্তানাং চশ্ত দ্বয়ম ।
এক বিংবশ্চ বর্ষণি কালবিদ্ ভিরুদা হৃতম ।।৪৯০।।
চিত্বা রিংশ দেবাতঃ কল্কিরাজস্ব রাজতা ।
ততোড জিটংজয়ো রাজা স্যাদিন্দ্রপুর সংস্থিতঃ ।।৪৯১।।"

(জিনসেন কৃত হরিবংশ পুরাণ, অ০ ৬০)

অন্য জৈন গ্রন্থকার গুণভদ্র উত্তর পুরাণে লিখেছেন যে মহাবীরের নির্বানের ১০০০ বছর পর কল্কিরাজের জন্ম হয় । (Indian Antiquary Vol. X V.P. 134)

তৃতীয় জৈন গ্রন্থকার নেমিচন্দ্র নিজের গ্রন্থ 'ত্রিলকসাগর' এর মধ্যে লিখেছেন, "শকরাজের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে এবং শককালের ৩৯৪ বছর ৭ মাস পরে কল্কিরাজের জন্ম হয় ।" এই গ্রন্থে এই ভাব বাক্যটি হল,

"পণছস্যং বস্যপণং মাসজদং গমিয় বীর নিবুই দো ।
সগরাজো সো কল্কি চতুণবতিয় মহিপ সগমাংসং ।।"

(ত্রিলোকসাগর, পৃষ্ঠা ৩২)

এইভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই সেই ব্যাক্তি ছিলেন যাঁর ব্যাপারে ধর্মাচার্যগণ বলেছেন ।

এটা অবশ্যই সত্য যে যতদিন শাসক শাসন করেন ততদিন পর্যন্ত জনগণ তাঁর নিয়মের পালন করেন, কিন্তু সেই শাসকের সাম্রাজ্য সমাপ্তির পর দ্বিতীয় শাসকের আদেশ শিরোধার্য হয়ে যায় । ঠিক সেই রকম যতদিন পর্যন্ত যে শাস্ত্রজ্ঞ, অবতার, পয়গম্বরের সময়কাল থাকে তাঁর আজ্ঞা-উপদেশের প্রচার প্রসার হয় কিন্তু তাঁর উপদেশের বিকৃতি আসা মাত্রই ঈশ্বরের তরফ থেকে দ্বিতীয় পয়গম্বর, অবতার চলে আসেন তখন তাঁর শাসন চলতে থাকে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্তিম 'রসুল' অথবা আখেরী অবতার 'কল্কি'র 'শাসনকালে' রয়েছি এবং প্রলয় (কিয়ামত) পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল চলবে, যার প্রমাণ পুরাণ, কুরআন এবং অন্য গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে । অতএব আমাদের জন্য এই অন্তিম রাস্তা (হযরত মুহাম্মাদ) এর শাসনে থেকে তাঁর উপদেশ এবং আচার আচরণের অনুসরণ করাটাই আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকেই উচিৎ । এতে আমাদের দুনিয়া এবং পরকাল উভয়ই সংশোধন হতে পারে ।

অতএব অন্তিম বার্তাবাহক, পয়গম্বর, 'কল্কি অবতার' হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপদেশকে অনুসরণই তাঁর প্রতি সঠিক এবং প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা অর্পন হবে । এটাই এই সমর্পনের জন্য সঠিক রাস্তা ।"

পারসী ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ

পারসীদের ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর দেবদূত জরথুষ্টকে 'জেন্দ আবেস্তা' গ্রন্থে বলেছেন, "ও জরথুষ্ট, মুসলিম সাথীদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হবে 'সোয়েসন্ত' (এখনও জন্মাননি) - দের মধ্যে থেকে, যে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।" (ফারবারদিন যশ্‌ত, ১৩ : ১৭)

ঠিক যেমন জরথুষ্টের অনুগামীরা ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষে পৌছেছিল, ঠিক তেমনভাবে, কিছুকাল পরে একটি ধর্ম ও জাতির উদয় ঘটবে যারা পৃথিবীকে নতুন প্রাণ দেবে; এবং এরা তাদের মহামানবকে সঙ্গ দেবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলিতে ।

আরও বলা হয়েছে যে, তার নাম হবে বিশ্ববিজয়ী, 'সোয়েসন্ত' এবং 'অস্তভাট - এরেটা' । তিনি 'সোয়েসন্ত' হবেন, কারণ তিনি গোটা পৃথিবীর মঙ্গল করবেন । তিনি 'অস্তভাট - এরেটা' হবেন, কারণ তিনি পার্থিব জগৎকে ধ্বংশের হাত থেকে

বাঁচাবেন । সেই সমস্ত ভূলের হাত থেকে রক্ষা করবেন যা ধ্বংশ করেছিল পৌত্তলিকদের ও মাজদানীয়দের । (ফারবারদিন যশ্‌ত, ২৮ : ১২৯)

এখানে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তিনি যে মঙ্গলময় বিজেতা ছিলেন তা তাঁর রক্তপিপাসু বিরোধীদের যে বিধান দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় । তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন । মক্কার পতনের পর তিনি বলেছিলেন, আজ তোমাদের প্রতি কোনও প্রতিশোধ নয় । তাঁর নাম মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসিত) । মুহাম্মাদ ছিলেন সমগ্র বিশ্বের কাছে মঙ্গলময় করুণাস্বরূপ, যেখানে অন্য পয়গম্বরগণ শুধুমাত্র তাদের নিজের লোকের কাছে করুণাস্বরূপ ছিলেন । তিনি যেভাবে পৌত্তলিকদের ও মাজদানীয়দের ভূল সংশোধন করেছিলেন তা অন্য কোনো পয়গম্বরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, এজন্যই তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ।

জরথুষ্ট আরও বলেছেন, ‘‘তোমরা এই ঘরের মধ্যে জ্বলতে পারো ! তোমরা দীর্ঘদিন ধরে এই গৃহের মধ্যে পুড়তে পারো । তোমরা এই ঘরে আলো জ্বালতে পারো ! তোমরা এই গৃহের মধ্যে বাড়তে পারো ! এমনকি দীর্ঘকাল ধরে এরূপ হবে । যতদিন না কোন কোনো কল্যানময় শক্তিশালী মহামানব এই পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।’’ (আতশ ন্যায়ারিশ : ৯)

এখানে ‘এস্তেভাট - এরেটার’ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হয় । ‘এস্তেভাট - এরেটার’ র আরবী অনুবাদ হল ‘মুহাম্মাদ’ । (তথ্যসূত্র ঃ হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ, মূল লেখক ড. এম. এ. শ্রীবাস্তব, বঙ্গানুবাদ - মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম)

সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের আগে যেসব ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে তাদের প্রত্যেকটিতে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব আছে । আল্লাহ বলে যদি কেউ না থাকতেন তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভাবিষ্যৎবাণী করা অন্য ধর্মের পক্ষে সম্ভব হত না । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের আগে যত শীর্ষস্থানীয় ধর্ম রয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । আল্লাহ বলে যদি কেউ না থাকেন তাহলে কিভাবে আগে জন্ম নেওয়া ধর্মীয় মহাপুরুষগণ যে ভবিষ্যবাণী করেছেন তা নিখুঁতভাবে কি করে মিলে গেল ? এর জবাব নাস্তিকদের কাছে আছে কি ?

সুতরাং আল্লাহ বলে একজন মহান শক্তিধর সত্তা আছেন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য । এ নিয়ে কোন সন্দহের অবকাশ নেই ।

আল কুরআনের বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ

যারা কুরআন শরীফকে আল্লাহর বাণী নয় বলে প্রচার করেন তাঁদেরকে মহান আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন ঃ

১) এ বিষয়ে যদি তোমরা সন্দিহান থাক যা আমি আমার বান্দার নিকট অবতীর্ণ করেছি তবে তোমরা এইরুপ একটি সুরা নিয়ে এস । আর যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাক । (সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৩, পারা ১, সুরা ২)

২) বল, যদি এ কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন একত্র সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবু তারা এর অনুরুপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না । (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৮, পারা ১৫, সুরা ১৭)

৩) এই আরবী কুরআনে কোন দোষ ত্রুটি নাই - যেন তারা সন্দেহ করে । (সুরা যুমার, আয়াত ২৮, পারা ২৪, সুরা ২৯)

৪) আচ্ছা তারা কি চিন্তা করে না কুরআন সম্বন্ধে ? যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসত তবে তারা এর মধ্যে অনেক আমিল ও গরমিল পেত । (সুরা নিসা, আয়াত ৮২, পারা ৫, সুরা ৪)

৫) এ ওই মহাগ্রন্থ যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই; ইহা ধর্ম-নিষ্ঠাবানদের জন্য পথপ্র দর্শক । (সুরা বাকারহ, আয়াত ২, পারা ১, সুরা ২)

এই আয়াতগুলির মধ্যে মহান আল্লাহপাক সমগ মানবজাতিকে কঠিনভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন । তিনি সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এসেছে তাহলে তারা কুরআনের মতো একখানি সুরা তৈরী করে দেখাক । প্রবীর ঘোষ সহ যেসব নাস্তিকরা মনে করেন যে কুরআন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর লেখা তাহলে তাদের উচিৎ কুরআনের মতো একটি সুরা তৈরী করে আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা । কিন্তু কিয়ামত

পর্যন্ত তারা আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবেন না কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন, “মানুষ ও জ্বিন একত্র সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবু তারা এর অনুরুপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না ।”

সুতরাং মহান আল্লাহ বলে একজন আতীন্দ্রিয় সত্ত্বা আছেন যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্ট করেছেন ।

ধর্ম বিরোধীদের পরিণাম

যারা আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তাকে অবিশ্বাস করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন,

১) অবশ্য যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে ও অহংকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে না এবং তারা ততক্ষণ জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে । এরুপ আমি অপরাধিদের প্রতিফল দিই । (সুরা আল আরাফ, আয়াত ৪০, পারা ৮, সুরা ৭)

২) যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুকরুপে গ্রহণ করেছিল ও পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণা করেছিল, আজ আমি তাদের বিস্মৃত হবো যেরুপ তারা এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিল ও যেরুপ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে (কুরআনের আয়াত) অস্বীকার করেছিল । (সুরা আল আরাফ, আয়াত ৫১, পারা ৮, সুরা ৭)

৩) আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন, “ওয়া লিল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম, আযাবু জাহান্নাম, ওয়াবিসাল মাসীর” অর্থাৎ “অস্বীকার করে যার আপন পালনকর্তাকে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, সেটা কতোই না জঘন্য স্থান ।” (সুরা মূলক, আয়াত ৬, পারা ২৯, সুরা ৬৭)

৪) অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের কথা মানবে না বরং কুরআনের বলে শক্তিশালী হয়ে তাদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম কর । (সুরা আল ফুরকান, আয়াত ৫২, পারা ১৮, সুরা ২৫)

আল কুরআনের অলৌকিকতা

'কম্পিউটার ও আল কুরআন' নামক গ্রন্থে লেখা আছে, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ রশীদ খলিফা ১৯৭৩ সালে আল কুরআন নিয়ে এক চমকপ্রদ গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে আল কুরআনের প্রতিটি অক্ষর যেভাবে কুরআনে সন্নিবেশিত আছে সেভাবেই কম্পিউটারে বিন্যস্ত করেন। এতে মুকাত্তাতসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে তিনি হিসাব কষতে থাকেন যে, আল কুরআনের মতো গাণিতিক বন্ধন সমৃদ্ধ অনুরুপ একটি পুস্তক প্রণয়নের ক ধরণের শ্রম ও খসড়া করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আল কুরআনের রচনাশৈলীতে ১১৮টি সুরার অবস্থান এবং এগুলিতে বিশেষ ১৪টি অক্ষর যে নিয়মে বিন্যস্ত হয়েছে কেবল এটুকুই হিসেবে আনেন। তখন পর্যন্ত কুরআনে ১৯ এর দুর্ভেদ্য বন্ধন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। যাহোক কম্পিউটার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হচ্ছে - গণিতের ফর্মূলা অনুযায়ী আল কুরআনের অনুরুপ একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য $১১৪^{১৪}$ বা অর্থাৎ ৬.৩×১০^{১৮} বার (৬৩ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০) বা ৬৩ অকটিলিয়ন বার প্রচেষ্টা নিতে হবে। বলাবাহুল্য এতোবার প্রচেষ্টার ফলে মাত্র একবারই প্রণীত হবে। প্রশ্ন হচ্ছে - আমরা সেই সফলতার সফল পুস্তকটি (আল কুরআন) ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। সুতরাং বাকী সবগুলো প্রচেষ্টাই হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ সেগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কোন না কোন ত্রুটি থাকবেই। এটাই কম্পিউটারের দেওয়া তথ্য।

আরো একটি ব্যাপার হচ্ছে কম্পিউটারে দেওয়া প্রদত্ত বিশাল সংখ্যার হিসাব ৬৩ অকটিলিয়ন। আমেরিকার প্রখ্যাত জ্যাতির্বিদ কার্ল সেগান মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধানে পরিচালিত গবেষণা ও অনুসন্ধানে সাফল্য লাভের প্রসঙ্গে প্রাণের সন্ধানে পরিচালিত গবেষণা ও অনুসন্ধানে সাফল্য লাভের প্রসঙ্গে বলেছেন, মহাবিশ্বে পৃথিবীর সমকক্ষ আর একটি গ্রহ খুঁজে পেতে হলে বিজ্ঞানীদের অন্ততঃ ১০০০ ০০০ ০০০ টি (এক বিলিয়ন) নক্ষত্র ও তাদের গ্রহে অনুসন্ধান চালাতে হবে। কাজটি অত্যন্ত দুরুহ এবং সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। এবার এক বিলিয়নকে ৬৩ অকটিলিয়নের পাশে চিন্তা করুন, তা কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ। অতএব একজন মানুষ, তিনি যত মহাজ্ঞানী, পন্ডিত ও বিচক্ষণ হোন না কেন, সারা জীবন সাধনা করেও যদি ধরেই নেই তিনি পৃথিবীর জন্ম থেকেই গবেষণা শুরু করে মহাধ্বংস বা কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করবেন, তবুও এ ক্ষেত্রে তার সফলতা আসবে না। আসা সম্ভব নয়। কারণ ৬৩ অকটিলিয়ন বার প্রচেষ্টা নিলে মাত্র একবারই সফলতা আসবে এবং আল কুরআনই হচ্ছে সেই একমাত্র সফল প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং বাকি সকল প্রচেষ্টাই হবে ব্যর্থ।

উপরন্তু আল কুরআনে উনিশ (১৯) এর দুর্ভেদ্য গাণিতিক বন্ধনের বৈশিষ্ট আবিস্কৃত হয়েছে । ফলে সমগ্র পরিস্থিতিটাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে । বর্তমানে নির্দিধায় বলা যায় - আল কুরআনের অনুরুপ একটি গ্রন্থ রচনার যে কোন প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে ।

আল কুরআনে এক অত্যাশ্চার্য সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল পাতা রয়েছে যা অতি অভিনব এবং অতিশয় বিস্ময়কর । এটি ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় বুনন । এ সম্পর্কে রায় দিয়েছে সর্বাধুনিক কম্পিউটার । ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে । বিশ্বে পড়েছে এক বিপুল সাড়া । চুড়ান্ত বিশুদ্ধতায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এসেছে - আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আরব মরুর এক অক্ষরজ্ঞানহীন "উম্মীর" উপর অবতীর্ন কুরআন সম্পর্কে ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন 'উম্মী' বা নিরক্ষর । তিনি লিখতে, পড়তে বা নিজের নামটিও সই করতে পারতেন না । অর্থাৎ তিনি যদি আল কুরআন লিখতেন বা রচনা করতেন, তবে ১৯ সংখ্যা ভিত্তিক গণিতের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম হিসেবগুলো তাঁকে কেবল মনে করেই সম্পন্ন করতে হতো । রাসুল (সাঃ) এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ছিল না সে কথা সকলেরই (বিধর্মী গবেষকরাও) একবাক্যে স্বীকার করেছেন । গবেষকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রাসুল (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মাত্র তেইশ বছর জীবিত ছিলেন । তখন তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে । যুদ্ধবিগ্রহ, শত্রুভয় ও নিজের লোদের সুসংগঠিত করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন তিনি । কাফিরদের অত্যাচার তো ছিলোই । কখনও কখনও দারিদ্রের কারণে দিন মজুরীর মতো কষ্টসাধ্য কাজও করেছেন তিনি । তাকে হিজরত করতে হয়েছে মাতৃভুমি থেকে ।

কোন শান্তিময় নিরবচ্ছিন্ন সুস্থির জীবনযাত্রা তাঁর ছিলোনা । অর্থাৎ আল কুরআন রচনা করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । উপরন্তু তিনি জীবনে কখনো নিজেকে কুরআনের রচয়িতা বলে দাবী করেননি । এমনকি ঘুনাক্ষরেও কোনদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রিয়তম স্ত্রীকে বা বিশ্বস্ততম বন্ধু হযরত আবু কবরকে (রাঃ) গল্পচ্ছলেও বলেননি যে, 'আমিই আল কুরআন লিখেছি এবং বইটিতে ১৯ এর দুর্ভেদ্য গাণিতিক বন্ধন প্রয়োগ করেছি ।'

আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । কোন মানুষ যদি তার রচিত গ্রন্থে গণিতের বন্ধর প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি নিশ্চয়

এমন কোন সংখ্যা প্রয়োগ করবেন যাকে সহজেই গুণ - ভাগ, যোগ - বিয়োগ করা যায় । কারণ তাতে করে হিসেব করার সুবিধা হয় । বিশেষ করে লেখক নিজে নিরক্ষর এবং গণিতের বিষয়ে অজ্ঞ হলে তিনি নিশ্চয় ১৯ সংখ্যাকে তার বইয়ের জন্য বেছে নিতেন না । বরং পূর্বের সংখ্যা ১৮ (যাতে ২, ৩, ৬ ও ৯ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়) বা পরের সংখ্যা ২০ (যাকে ২, ৪, ৫, ১০ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়) বেছে নিতেন । কারণ ১৯ কে ১৯ ছাড়া অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না ।

এতদ্বসত্বেও বিধর্মীরা সকল যুক্তির পাশ কাটিয়ে বলতে পারে যে, রাসুল (সাঃ)ই আল কুরআন লিখেছেন এবং তাঁর নিজেরই অজান্তে হঠাৎ আচমকা সমস্ত কুরআন শরীফে ১৯ এর রহস্যময় গাণিতিক বন্ধন চালু হয়ে গেছে ! কি আশ্চর্য কথা !

অবশ্য থিওরী অব প্রোবাবিলিটি অনুযায়ী সেটা হতেও পারে, যদিও সেজন্য অসংখ্যা খসড়া প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে । যাহোক, কম্পিউটারকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা হয়েছিল যে, কোন মানুষের পক্ষে নিজের অজ্ঞাতে ১৯ এর দুর্ভেদ্য ফর্মূলা প্রয়োগ করে আল কুরআনের মতো এমন একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করা আদৌ সম্ভব কিনা ?

কম্পিউটার হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আবিস্কার । যে কোনো হিসেবের জন্য আমরা এর উপর নির্ভর করতে পারি । এই কম্পিউটার জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রকাশ করেছে এক বিস্ময়কর ফলাফল - সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর সমস্ত বয়স জুড়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যেত অনুরুপ একখানি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবু তা চিরদিন থেকে যেত সম্ভাব্যতার সীমানা থেকে অনেক বাইরে । কুরআনে যেসব নিয়ম - কানুন শৃঙ্খলা মানা হয়েছে, ১৯ সংখ্যার জটিল জালকে যেভাবে এঁকে দেওয়া হয়েছে এঁর মধ্যে - তেমনিভাবে সমশব্দে সম বাক্য সংখ্যায় সমানসংখ্যক অক্ষরে একটি অনুরুপ বৈশিষ্টের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত $৬.২৬x১০^{১৬}$ বছর । তাও আবার একটি মানুষ যদি এইটুকু ‘পরিমানগত কাজ’ (Volumetric work) প্রতিমাসে একটি করে করবার ক্ষমতা রাখেন, তার জন্য এই পরিমাপ ।

উল্লেখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির মান কত ? এর পরিমাপ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন এবং তা অনুধাবনের অনেক বাইরে । সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ ৬২৬

০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ (৬২৬ এর পর ২৪ টি শূন্য) আপনার নিশ্চয় জানা আছে পৃথিবীর বয়স কত ? মাত্র ৪৫০, ০০০০০০০ (৪৫০ কোটি) বৎসর। জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিই শীর্ষতম। আমরা জানি আজকের দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আল কুরআনের অনুরুপ একখানি গ্রন্থ লেখার কাজে নিয়োজিত বলে ধরে নেই, তবে উক্ত কম্পিউটার লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ জাতির এই মহাসম্মেলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মাত্রা মান হবে ৪৫০, ০০০০০০০০x৫০০০০০০০০০=২২৫ x১০^{১৭} কর্ম - বছর, যা সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটির ভাগের মাত্র ৩৫ ভাগের সমান; অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার সমান সংখ্যক মানুষ যদি পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকত কুরআনের অনুরুপ কোন গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবে ৪৫০ কোটি বছর বয়সে আজকের দিন পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হত, তার পরিমাণ হত সমুদয় প্রকল্পটির মোট কাজের একশ' কোটি ভাগ করে তা থেকে মাত্র ৩৫ ভাগ নিলে যতটুকু পরিমাণ হয় - ততটুকু (.০০০০০০০৩৫), যা হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি নুড়ির তুল্য। আর এ প্রকল্পের শর্ত হল এই যে, প্রতিটি মানুষেরই আয়ুস্কাল ৪৫০ কোটি বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্তুতঃ মহাহিম পরম ক্ষমতাশালী, সমস্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, অতীন্দ্রীয়, লাশরীক মহান আল্লাহতায়ালা ছাড়া 'আল কুরআন' প্রণয়ন করো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আল কুরআন তাঁরই অবিনশ্বর অলৌকিক নিদর্শন।

বস্তুতঃ মহাহিম পরম ক্ষমতাশালী, সমস্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, অতীন্দ্রীয়, লাশরীক মহান আল্লাহতায়ালা ছাড়া 'আল কুরআন' প্রণয়ন করো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আল কুরআন তাঁরই অবিনশ্বর অলৌকিক নিদর্শন। (কম্পিউটার ও আল কুরআন, ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, পৃষ্ঠা - ১০/১৪, লেখা প্রকাশনী, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত)

সুতরাং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ রশীদ খলিফা যে কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণা করে বলেছেন এই কুরআনের বৈশিষ্টের মতো কুরআন রচনা একবারই সম্ভব। আর যেহেতু আল কুরআন একবার আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ন হয়ে গেছে সেজন্য এই কুরাআনের মতো গ্রন্থ রচনা করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ন হয়েছে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সুতরাং আল্লাহ যে আছেন তা স্পষ্ট।

এখানে বলে রাখা উচিৎ যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ রশীদ খলিফা কোন সাধারণ বিজ্ঞানী ছিলেন না । তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী । তিনি ১৯ নভেম্বর ১৯৩৫ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১ জানুয়ারী ১৯৯০ সালে ৫৪ বছর বয়সে মারা যান । ডঃ রশীদ খলিফা কায়রোর এইন শাম্‌স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৯ সালে আমেরিকা আসেন এবং ১৯৬৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব রসায়নবিদ্যায় পিএইচডি (Ph.D) লাভ করেন । তিনি ১৯৭৫ - ৭৬ সালে প্রায় বছর খানেক লিবিয়া সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । পরবর্তীকালে তিনি রসায়নবিদ্‌ হিসাবে জাতিসংঘের অধীনে ভিয়েনাতে শিল্প উন্নয়ন সংস্থায় যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯৮০ সালের দিকে সিনিয়র রসায়নবিদ হিসেবে আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের সরকারী রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তিনি প্রায় বিশটির মত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা করেন । তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থটির নাম হল, “The Computer Speaks: God’s Message to the World” রাশেদ খলিফার লেখা গ্রন্থ, আর্টিকেল বা গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ঠিকানায় International Community of Submitters (ICS), P.O. Box 43476, Tucson, AZ 85733 এবং ওয়েবসাইট http://www.submission.oorg ।

কুরআন সম্পর্কে ডঃ রশীদ খলিফার এই বিস্ময়কর গবেষণা নাস্তিক্যবাদীদের মুখে এক বিরাট থাপ্পড় । কেননা যে বিজ্ঞানকে নাস্তিক্যবাদীরা সত্যের মানদন্ড বলে মনে করে সেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিস্কার কম্পিউটারে আল কুরআনের উপর গবেষণায় আজ প্রমাণ হয়ে গেছে এই গ্রন্থ কোন মানব রচিত নয় এবং এই রকম বৈশিষ্টপূর্ণ গ্রন্থ আর দ্বিতীয়বার লেখা সম্ভব নয় । আর মহান আল্লাহপাক তো কুরআন শরীফে এই জন্যই চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করেছেন,

“বল, যদি এ কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন একত্র সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবু তারা এর অনুরুপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না ।” (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৮, পারা ১৫, সুরা ১৭)

আল কুরআনের ১৯ সংখ্যার রহস্য

ডাঃ রাশিদ খলিকা যে উনিশ সংখ্যা নিয়ে কম্পিউটারে গবেষণা করেছেন তা কম্পিউটার ও আল কুরআন নামক গ্রন্থে লেখা আছে, উনিশ কেবলই

একটা সংখ্যা । অর্থাৎ দশ যোগ নয় । বহু শতাব্দী ধরে এই ধারণা প্রচলিত হয়ে আসছে । আজো এই ধারণা অপরিবর্তিত আছে ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সংখ্যা তার সংখ্যামান (Numerical) অতিক্রম করেও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে । যেমন পৃথিবীর যে কোন দেশের একজন মুসলমান বালককেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ৭৮৬ কী ? সে তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় বলবে,

بسم الله الرحمٰن الرحيم

'পরম করুণাময় অত্যান্ত দাতা আল্লাহর নামে (শুরু করিলাম) !' কেমন করে ৭৮৬ সংখ্যাদ্বারা এই বাক্য বুঝান হয় তার ব্যাখ্যা সময় সাপেক্ষ । সংক্ষেপে বলা যায় আরবী ও হিব্রু ভাষার অক্ষরগুলি নিজস্ব একটা সংখ্যামান থাকে । উপরোক্ত বাক্যটির অক্ষর সমূহের সংখ্যামান হিসেব করলে যোগফল হয় ৭৯৬ । অর্থাৎ ৭৮৬ হচ্ছে বাক্যটির অক্ষরসমূহের মোট সংখ্যামান বা সূত্র ।...........

সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী আরবী বর্ণমালার অক্ষরসমূহের সংখ্যামান

د ৪	خ ৩	ب ২	ا ১
ح ৮	ز ৭	و ৬	ه ৫
ل ৩০	ك ২০	ي ১০	ط ৯
ع ৭০	س ৬০	ن ৫০	م ৪০
ر ২০০	ق ১০০	ص ৯০	ف ৮০
خ ৬০০	ث ৫০০	ت ৪০০	ش ৩০০
غ ১০০০	ظ ৯০০	ض ৮০০	ز ৭০০

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا ৪	م ৩	س ২	ب ১

ا ৮	ه ৭	ل ৬	ل ৫
م ১২	ح ১১	ر ১০	ل ৯
ر ১৬	ل ১৫	ا ১৪	ن ১৩
	م ১৯	ي ১৮	ح ১৭

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এই শব্দের মধ্যে মোট ১৯ টি আরবী অক্ষর আছে এবং মোট শব্দ চারটি । শব্দসমূহ সূরা সমূহের মধ্যে মোট যতবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ।

ইস্‌ম (অর্থাৎ নাম)	১৯ বার (১৯x১ = ১৯)
আল্লাহ	২৬৯৮ বার (১৯x১৪২ = ২৬৯৮)
আররহমান (অর্থাৎ পরম করুণাময়)	৫৭ বার (১৯x৩ = ৫৭)
আর্‌রহিম (অর্থাৎ অনন্তদাতা)	১১৯ বার (১৯x৬ = ১১৪)

আচ্ছা, এতোগুলো ক্ষেত্রে ১৯ এর ফর্মূলা কীভাবে মিলে গেল ? এ কি একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব !

বিস্ময়ের শেষ এখানে নয় । বরং এখানেই শুরু । লক্ষ্য করুন কুরআনের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪ টি যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য । ১৯ X ৬ = ১১৮ ।..........

আবরী বর্ণমালা মোট অক্ষর সংখ্যা আটাশটি

ث	ت	ب	ا
د	خ	ح	ج
س	ز	ر	ذ
ط	ض	ص	ش
ف	غ	ع	ظ
م	ل	ك	ق
ي	ههه ه	و	ن

মুকাত্তাত যে অক্ষরসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

ك	ر	م	ل	ا
ط	ص	ع	ي	ه
ه	ن	ق	س	

মোট চোদ্দটি অক্ষর অর্থাৎ বর্ণমালার অর্ধেক সংখ্যক অক্ষর

মুকাত্তাত এবং কুরআনের শীল বিসমিল্লালহ এর অক্ষরসমূহের মধ্যে এক অভুতপুর্ব সাদৃশ্য রয়েছে । বিসলিল্লাহের রয়েছে মোট দশটি অক্ষর (একই অক্ষরের পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে) যার মধ্যে নয়টি অক্ষরই মুকাত্তাতও ব্যবহৃত হয়েছে । যে অক্ষরটি মুকাত্তাতে ব্যবহৃত হয়নি তা হচ্ছে (বা) ।

الٓمٓر	الٓر	حٰمٓ	الٓمٓ
كٓهٰيٰعٓصٓ	يٰسٓ	طٰسٓمٓ	طٰسٓ
حٰمٓ عٓسٓقٓ	قٓ	صٓ	الٓمٓصٓ
	طٰهٰ	نٓ	

মুকাত্তাতসমূহ উনত্রিশটি সুরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১৪ টি অক্ষর
১৪ টি মুকাত্তাত
২৯ টি সুরা
যোগফল ৫৭ উনিশ দ্বারা বিভাজ্য ১৯X৩ = ৫৭

আল কুরআনের অলৌকিকত্বের আরো বহু নিদর্শন রয়েছে । পৃথিবীর বুকে আল কুরআন একমাত্র গ্রন্থ যার বিভিন্ন অধ্যায়ের (সুরা) শুরুতে বিচিত্র অক্ষর বিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে । এই অক্ষর - বিন্যাসগুলোকে বলে মুকাত্তাত সহজ করে একে বলা যায় - সুরা বাকারা শুরু হয়েছে আলীফ লাম মীম শব্দ দিয়ে । এর অর্থ কি কেউ জানেনা । কারণ আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেননি । এমনিভাবে মোট ১৪ টি বিভিন্ন বর্ণ ১৪ টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে মোটট ২৯ টি সুরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে । এদের যোগ ফল (১৪+১৪+২৯ = ৫৭), যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯X৩ = ৫৭ ।

বৈচিত্রপূর্ন শব্দ বা মুকাত্তাত থেকে একটি বিষয় সহজেই পরিস্কার হয়ে উঠে যে, অক্ষরসমূহ কখনো একা, কখনো দুটি, কখনো তিন, চার এমনকি পাঁচটি অক্ষর একই মুকাত্তাতে ব্যবহৃত হয়েছে । অলৌকিকত্বের বিচারে আসুন একক অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাত সম্বলিত সুরাগুলিকে বেছে নিই । দেখা যাচ্ছে সুরা আল কালাম বা ৬৮ তম সুরা হচ্ছে কুরআনের ধারাবাহিকতায় শেষ সুরা যার শুরুতে এক অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাত ব্যবহৃত হয়েছে । ছোট্ট গণনার কাজটি যে কেউ করতে পারেন । সেজন্য আরবী জানার দরকার হয়না । কেবল ن ‘নুন’ (অরবী শব্দ) অক্ষরটিকে বাক্যের ز ‘যা’ চিনে নিতে পারলেই হলো । সুরাটিতে মোট ১৩৩ বার ن ‘নুন’ ব্যবহৃত হয়েছে যা অবশ্যই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯x৭ = ১৩৩ ।

সুরা	মুকাত্তাত
সুরা সা’দ (৩৮ নম্বর সুরা)	صٓ
সুরা ক্বাফ (৫০ নম্বর সুরা)	قٓ
সুরা কালাম (৬৮ নম্বর সুরা)	نٓ

ইতিমধ্যে সুরা কালাম সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে । বাকী দুটো সুরার মধ্যে সুরা ক্বাফ এর মুকাত্তাত হচ্ছে ক্বাফ । আসুন একটু জটিল হিসাব কষা যাক । যেমন ক্বাফ অক্ষর সম্বলিত সুরাগুলো খুঁজে দেখুন । এগুলো হচ্ছে ৪২ তম সুরা শূরা এবং ৫০ তম সুরা ক্বাফ । সুরা শূরার শুরুতে পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাত আছে । মুকাত্তাতের অক্ষরগুলো হচ্ছে ق س ع م ح এই অক্ষরগুলো সর্বমোট যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার পরিমাণ ৫৭০ অর্থাৎ ১৯ দ্বারা বিভাজ্য । ১৯x৩০ = ৫৭০ ।

এবারে একক অক্ষর ق ক্বাফ এর কথাই ধরা যাক । মাত্র দুটি সুরার শুরুতে ক্বাফ অক্ষর সম্বলিত মুকাত্তাত আছে । সুরাদ্বয়ে মোট ১১৪ বার ক্বাফ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য । ১৯x৬ = ১১৪ ।

ধরে নেওয়া যাক ক্বাফ অক্ষরটি কুরআনের নাম 'আল ফুরকান' থেকে এসেছে । যেমন আমরা মিষ্টার লিখি মিঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ ق ক্বাফ অক্ষর কুরআনকেই প্রকাশ করেছে । (এব্রেভিয়েশন বা সংক্ষিপ্ত করতে) । তবে সহজেই অনুমেয় প্রত্যেক সুরার জন্য একবার হিসেবে ق ক্বাফ অক্ষর এসেছে । কারণ মোট সুরার সংখ্যা ১১৪ । বস্তুতঃ এভাবে আল্লাহ তাঁর অসীম মোজেজা আল কুরআন এবং কেবলমাত্র আল কুরআনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।

বিধর্মীদের দাবীর কথা আবার মনে করছি, তারা বলেছে আল কুরআন নিরক্ষর মরুবাসী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রচিত (নাউজুবিল্লাহ) । এবারে উপরে ق ক্বাফ এর প্রদত্ত হিসাবকে একটু তলিয়ে দেখা যাক ।

যেহেতু ক্বাফ অক্ষর এর মুকাত্তাত বিশিষ্ট মাত্র দুটি সুরা আছে । অন্য সুরা অর্থাৎ ৫০ তম সুরার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু ভিন্ন । কারণ যদি ধরে নিই রাসুল (সাঃ) আল কুরআনের রচয়িতা তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, সুরা রচনার পর এর ক্বাফ অক্ষরগুলি গুণে তিনি দেখলেন মোট ৫৮ বার ক্বাফ ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু ৫৮ তো ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয় । তবে ১ টি ক্বাফ বাদ দিলে ৫৭ টি ক্বাফ থাকে যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য । প্রশ্ন হচ্ছে সেক্ষেত্রে তিনি কোনটা বাদ দিতেন ? কারণ কেবলমাত্র সুরার শুরুতে মুকাত্তাত এর একক অক্ষর ক্বাফ ق ব্যতিত সবগুলো ক্বাফই শব্দের অংশ বিশেষ । তবে কি প্রথমে লিখিত মুকাত্তাতকে বাদ দিতেন ? সেটাই সোজা কারণ তাতে অর্থের বিশেষ কোন পরিবর্তন নয়না । তা ছাড়া মনে রাখতে হবে রাসুল (সাঃ) ছিলেন নিরক্ষর । কাগজ কলমের সাহায্য ছাড়া দীর্ঘ সুরাটি থেকে সাফল্যের সঙ্গে অর্থের পরিবর্তন না করে একটি ক্বাফ বাদ দেওয়া রীতিমতো অসম্ভব । ধরে নিই প্রথম শব্দ, সেই মুকাত্তাতটিকে সরিয়ে দিলেন, যেন সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব ঠিক রাখা যায় । বাস্তবিকই এতে মোট ক্বাফ হলো ৫৭ বার যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য । কিন্তু এতে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে । কারণ মুকাত্তত বাদ দিলে সুরাটি মুকাত্তাত সম্বলিত সুরা সমূহের তালিকা থেকে বাদ যাবে । সেক্ষেত্রে এতোক্ষণ যে সকল হিসাব দেখানো হলো কোনোটাই সম্ভব হবে না । তাহলে কি এই সমস্যার সমাধান নেই ? মহামহিম পরম পরাক্রমশালী গ্রন্থকার মহান আল্লাহ বিস্ময়কর দুরদর্শিতার সাথে সমস্যাটির সমাধান করেছেন ।

সুরা ক্বাফ এর ১৩ তম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন । আয়াতটিতে আদ ফিরআউন ও লুত এর ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিজেদের মন্দ কাজের প্রতিফল স্বরুপ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বারোটি স্থানে লুত - সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন । প্রতিটি ক্ষেত্রে একই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

قَوْمُ	قَوْمُ

একমাত্র ব্যতিক্রম এই ১৩ নং আয়াতে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١١﴾
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٢﴾
وَأَصْحَٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٣﴾
وَإِخْوَانُ لُوطٍ

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٢﴾

এখানে وَإِخْوَانُ لُوطٍ (ইখওয়ানু লুত) কথাটির অর্থ লুত এর ভায়েরা (অর্থাৎ অনুগামী বা সহগামীরা) । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বারোটি স্থানে লুত - সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন । সর্বক্ষেত্রেই قَوْمُ نُوحٍ (ক্বাওমোলুত) বা লুত এর স্বজাতি কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে । একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে এইখানে; ৫০ তম সুরার ১৩ নং আয়াতে ।

যেখানে قَوْمُ نُوحٍ (ক্বাওমোলুত) না বলে وَإِخْوَانُ لُوطٍ (ইখওয়ানু লুত) বলা হয়েছে । যদিও ঘটনার বর্ণনা ও অর্থ একই অবিচ্ছেদ্য উদ্দেশ্যের অনুগামী; তথাপি, কেবলমাত্র এই একটি স্থানে ব্যতিক্রম হবার কারণ কি ? অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য

করতে হয় যে, যদি অন্যান্য স্থানের মতো এক্ষেত্রেও قَـوْمُ لُـوْطٍ (ক্বাওমোলুত) ব্যাবহৃত হত তবে সুরা ক্বাফ এ মোট

ق এর সংখ্যা দাঁড়াতো ৫৮ তে ফলে ৪২ ও ৫০ তম সুরার মোট ق এর সংখ্যা হতো ৫৭+৫৮ = ১১৫ । ১১৫ উনিশ দিয়ে বিভাজ্য হয়না । উনিশ এর ফর্মূলাও খাটেনা । অতএব কেবল অঙ্কের হিসাব মিলাবার উদ্দেশ্যেই পরম দুরদর্শিতার সাথে আল্লাহ সমগ্র কুরআনের কেবল একটি মাত্র স্থানে وَاِخْـوَانُ لُـوْطٍ (ইখওয়ানু লুত) ব্যবহার করেছেন । ফলে মোট ক্বাফ এর সংখ্যা হয়েছে ৫৭+৫৭ = ১১৪ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য । ১৯x৬ = ১১৪ । পক্ষান্তরে মানব রচিত গ্রন্থ হলে এ ক্ষেত্রেও অন্যান্য স্থানের মতোই وَاِخْـوَانُ لُـوْطٍ ব্যবহৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক । কিন্তু কুরআন তো মহাপ্রভূ আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন ।

একক অক্ষর সম্বলিত মুকাত্তাত বিশিষ্ট সুরাগুলির মধ্যে কেবল সুরা সাদ আমাদের আলোচনা করতে বাকী আছে । সুরা সাদ ছাড়াও আল কুরআনের ৭ এবং ১৯ নম্বর সুরার শুরুতে সোয়াদ এর ব্যাবহার হয়েছে মোট ১৫২ বার । ১৫২, ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ।

সুরা	প্রথম শব্দ	সাধারণ অক্ষর	মোট ব্যবহার হয়েছে
সপ্তম	الٓمٓصٓ	ص	৯৭ বার
উনিশতম	كٓهٰيٰعٓصٓ	ص	২৬ বার
আটত্রিশতম	صٓ	ص	২৯ বার

যোগফল হয় (১৯x১৮) = ১৫২

অতএব দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রেও ১৯ এর ফর্মূলা অব্যর্থ ।

১৯ তম সুরার কথা ধরা যাক - এর মুত্তকাত একটি বিরাট শব্দ । كٓهٰيٰعٓصٓ কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ । যার অক্ষরসমূহ মোট ৭৯৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে । ৭৯৮ অবশ্যই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য । (১৯x৪২ = ৭৯৮) । কাফ ك ৩৯৭ বার, হা ه ১৭৫ বার, ইয়া ي ৩৪৩ বার, আইন ع ১১৭ বার এবং সোয়াদ ص ২৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে

কাফ	ك	১৩৭ বার
হা	ه	১৭৪ বার
ইয়া	ي	৩৮৩ বার
আইন	ع	১১৭ বার
সোয়াদ	ص	২৭ বার

সুরা আরাফ (৭ম সুরা) এর শুরুতে মুকাত্তাত আছে الٓمّٓصٓ আলিফ লাম মীম সাদ । সমগ্র সুরাতে এর অক্ষর সমুহের মোট পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এভাবে ।

আলিফ	ا	২৫২৯ বার
লাম	ل	১৫৩০ বার
মীম	م	১১৬৪ বার
সাদ	ص	৯৭ বার

(১৯x২৮০ =) ৫৩২০

৫৩২০, ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ।

এবারে আলোচিত সুরা তিনটির মধ্যে সপ্তম সুরা আল আরাফ এর ৬৯ তম আয়াতের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

بَصْۜطَةً বাছতাতান শব্দটির বানানের প্রতি লক্ষ্য করুন । এখানে মূলত চারটি অক্ষর বা, সোয়াদ, তৈ, তে (ط ب ص এবং ت) ব্যবহৃত হলেও সোয়াদ এর উপর ছোট্ট সীন বসানো হয়েছে । সমগ্র কুরআন এমনকি আরবী ভাষায় بَصْۜطَةً বাছতাতান শব্দের প্রকৃত বানান সীন দিয়ে লেখা হয় । কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম সুরা আরাফ - এর ৬৯ তম আয়াত, সেখানে একটি অতিরিক্ত সোয়াদ ব্যবহৃত হয়েছে ।

আল কুরআনেই অন্যস্থানেও বাছতাতান শব্দটি এসেছে । এবং সেক্ষেত্রে শুদ্ধ বানানে সীন দিয়ে লেখা হয়েছে । উদাহরণ স্বরুপ সুরা বাকারার ২৪৭ আয়াত দ্রষ্টাব্য -

قَــالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْـطَـفٰــهُ عَـلَـيْـكُـمْ ....

وَزَادَهٗ بَـسْـطَـةً فِــى الْـعِـلْـمِ وَالْـجِـسْـمِ ؕ

بَـسْـطَـةً

ب	س	ط	ت

আল কুরআন ২ ঃ ২৪৭

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যদি সুরা আরাফ এর ৬৯ আয়াতে সোয়াদ অক্ষর ব্যাবহার না করা হতো তবে ইতিপূর্বে সোয়াদ অক্ষর নিয়ে যতগুলো হিসাব কষে ১৯ এর ফর্মূলা মিলানো হলো সবগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো ।কারণ একটি সোয়াদ কম পড়তো । মহান আল্লাহ তাঁর অশেষ ক্ষমতার গুণে সেই ভ্রান্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন ।

একটা ব্যাপার পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন । বানান যাই হোক না কেন, শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ একই থাকছে । অর্থাৎ ص বা س যা দিয়েই লিখিনা কেন বাছতাতান শব্দের অর্থ দেওয়া বা প্রদান করা । অনেকটা যেমন S বা C যা দিয়েই লিখি Pensil বা Pencil মানে একই বুঝায় । স, শ বা ষ যে কোনটি দিয়ে পোশাক লেগে যায় এতে অর্থের তেমন পরিবর্তন হয় না । তবু প্রশ্ন আসে এই একই মাত্র ক্ষেত্রে কেনইবা শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত আমরা ভুল বানান লিখে চলেছি ?

আরও একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করার মতো । কাগজ ও ছাপাখানা আবিস্কার হবার পূর্বপর্যন্ত কয়েক শতাব্দী আল কুরআন কেবল হাতে লিখেই বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়েছে । এই সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের যে কোন একজনের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, নিশ্চয় তার পিতা বা পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ এত বিশাল গ্রন্থ হাতে অনুলিপি করতে গিয়ে সুরা আরাফের ৬৯ তম আয়াতে ভুলক্রমে বাছতাতান বানান সোয়াদ লিখে থাকবেন । কারণ সমগ্র কুরআন তথা সমগ্র আরবী ভাষায় বাছতাতান বানানের এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম । অথচ এমনটি কোনদিন হয়নি । রাসুলের (সাঃ) নির্দেশে যেভাবে মূল কুরআন লিখিত হয়েছিল আজো ঠিক সেই আকইরুপে অবিকৃতভাবে মহাগ্রন্থ বিরাজ করছে । বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ এর রক্ষাকর্তা ।

‘‘নিশ্চয় আমি সংবাদ বাহক (কুরআন) নাযিল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি উহাকে (কলুষতা ও ত্রুটি হইতে হেফাযত করিব ।’’ (আল কুরআন ১৫ ঃ ৯)

মহান আল্লাহ কী অপূর্ব দক্ষতায় তাঁর সংকল্প রক্ষা করেছেন । ভাবলে অবাক হতে হয় । শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে । নিজেরই সমস্ত মন প্রাণ এক আল্লাহর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে চায় ।

এমনকি অসংখ্য উদাহরণ পেশ করে মহাগ্রন্থা আল কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেজার আরো প্রমাণ উত্থাপন করা যায় ।

যে কোন সুরা - যার শুরুতে মুকাত্তাত আছে তাকে নিয়ে পরীক্ষা করলেও ১৯ এর ফর্মূলা অব্যর্থভাবে মিলে যাবে । কুরআনের দ্বিতীয় সুরার কথায় ধরা যাক । এর প্রথম শব্দটি খুবই পরিচিত । ই (আলিফ লাম মীম) । যে সকল সুরার শুরুতে (২, ৩, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ নম্বর) এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেসব সুরায়

আলিফ লাম মীম অক্ষর সমূহের মোট পুনরাবৃত্তির পরিমান ১৯৮৭৪ বা যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য । ১৯x১০৭৬ । পৃথকভাবে প্রত্যেকটির সুরার ক্ষেত্রে মুকাত্তাত এর অক্ষর গুলোর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করলেও একই ফল পাওয়া যাবে । অর্থাৎ প্রত্যেক বারই তা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য । যেমন -

দ্বিতীয় সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	১৮৯৯ বার (১৯x৫২১)
তৃতীয় সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	৫৬৬২ বার (১৯x২৯৮)
উনত্রিশতম সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	১৬৭২ বার (১৯x৮৮)
ত্রিশতম সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	১২৫৪ বার (১৯x৬৬)
একত্রিশতম সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	৮১৭ বার (১৯x৪৩)
বত্রিশতম সুরায় আলীফ, লাম ও মীম ব্যবহৃত হয়েছে	৫৭০ বার (১৯x৩০)

অন্য একটি সুরার কথা ধরা যাক । কুরআনের ৩৬ তম সুরাটি শুরু হয়েছে (ইয়া সীন) يسٓ মুকাত্তাত দিয়ে । সুরাটিতে এই অক্ষরদুটি, ي এবং س মোট ২৮৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯x১৫ = ২৮৫) ।

তেমনি কুরআন শরীফের ৪০ তম সুরা থেকে ৪৬ তম সুরা পর্যন্ত প্রত্যেকটি সুরাতে একই মুকাত্তাত হামীম حمٓ ব্যবহৃত হয়েছে । এই সাতটি সুরায় হা ح এবং মীম م অক্ষর দুটি মোট ২১৪৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য । (১৯x১১৩ = ২১৪৭)

الٓمٓ			
সুরা	م	ل	ا
২. আল বাকারা	২১৯৫ বার	৩২০২ বার	৪৫০২ বার
৩. আল ইমারান	১২৪৯ বার	১৮৯২ বার	২৫২১ বার
২৯. আনকাবুত	৩৮৮ বার	৫৫৪ বার	৭৭৪ বার
৩০. রূম	৩১৭ বার	৩৯৩ বার	৫৪৪ বার
৩১. লোকমান	১৭৩ বার	২৯৭ বার	৩৪৭ বার
৩২. সাজদাহ	১৫৮ বার	১৫৫ বার	২৫৭ বার
	মোট ৪৪৩৬	মোট ৬৪৯৩	মোট ৮৯৪৫
	৪৪৩৬+৬৪৯৩+৮৯৪৫ = ১৯৮৭৪		

এই ১৯৮৭৪ ও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯ঃ১০৭৬ = ১৯৮৭৪)।

কুরআনের ৪২ তম সুরার শুরুতে মুকাত্তাতটি দীর্ঘ পাঁচ অক্ষর সম্বলিত حٓمٓ عٓسٓقٓ হামীম আইন সীন ক্বাফ। এর মধ্যে হমীম নিয়ে হিসেব হয়েছে। এবারে বাকী অক্ষর তিনটি নিয়ে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে ৪২ তম সুরায় মোট ২০৯ বার এই عٓسٓقٓ আইন সীন ক্বাফ অক্ষরত্রয় ব্যবহৃত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। (১৯x১১ = ২০৯)

মুকাত্তাতগুলির মধ্যে হা ০ তাহা طٰهٰ তাসীন طٰسٓ তা সীন মীম طٰسٓمٓ আছে ১৯, ২০, ২৬ ও ২৮ তম সুরায়। এই পাঁচটি সুরায় মুকাত্তাতসমূহের অক্ষরগুলো মোট ১৭৬৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার যে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। (১৯x৩ = ১৭৬৭)।

দশম ও একাদশতম সুরা শুরু হয়েছে الٓرٰ আলীফ লাম রা মুকাত্তাত দিয়ে। সুরাদ্বয়ে অক্ষরতিনটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ২৪৮৯ বার যা উনিশ (১৯) দিয়ে বিভাজ্য। (১৯x৩১ = ২৪৮৯)

দ্বাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ সুরা তিনিটির শুরুতে একই মুকাত্তাত আলীফ লাম রা আছে। সুরা তিনটিতে অক্ষরগুলো যথাক্রমে মোট ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

দ্বাদশতম সুরায়	২৩৭৫ (১৯x১২৫) বার
চতুর্দশতম সুরায়	১১৯৭ (১৯x৬৩) বার
পঞ্চদশতম সুরায়	৯১২ (১৯x৪৮) বার

ত্রয়োদশ সুরার মুকাত্তাত হচ্ছে الٓمٓرٰ এতে আছে চারটি অক্ষর। সুরাটিতে অক্ষরগুলো মোট ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৮২ বার যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৪৮২ = ১৯x৭৮)

সপ্তম সুরার মুকাত্তাত الٓمٓصٓ এর চারটি অক্ষর সুরাটিতে মোট ৫৩২০ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। ৫৩২০ = ১৯x২৮০।

এমনি আরো উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে । এইসব সুক্ষ্ম গাণিতিক বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র আল কুরআনের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে অতিনিবিড় সম্পর্ক এবং অবিচ্ছেদ্য অদৃশ্য বাঁধন তৈরী করা । ফলে যে কোনো অংশের একটি শব্দ এমনি একটি অক্ষর পরিবর্তন করলেই তা সহজে ধরা পড়ে যাবে । অর্থের পরিবর্তনা বা বিকৃতি প্রসঙ্গ বাদই দিলাম । মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভাষার লালিত্য, বিষয় বস্তুর বৈচিত্র, জ্ঞানগর্ভ সমৃদ্ধ বাণী, কাব্যময়তা, নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিষয়বস্তু, কিংবা সুক্ষ্ম শিল্পরস উপেক্ষা করলেও কেবল এই একটি বিষয় অর্থাৎ উনিশ এর গাণিতিক বন্বনের বৈশিষ্টই আল কুরআনকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ট মহাগ্রন্থ হিসেবে মনে রাখবে ।*

বিজ্ঞানী ডাঃ রাশিদ খলিকার কুরআন শরীফ সম্পর্কে এই বিস্ময়কর গবেষণা নাস্তিক্যবাদীদের মুখের উপর এক বিরাট থাপ্পড় । খলিফা সাহেবের গবেষণাই কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ । এই রকম বৈশিষ্টপূর্ণ গ্রন্থ কোন মানুষ দ্বারা রচিত হতে পারে না ।

সুতরাং মহান আল্লাহ যে আছেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই । আর নাস্তিকতাবাদ যে শতাব্দীর সেরা কুসংস্কার তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

ডঃ রশীদ খলিফার বিরুদ্ধে প্রবীর ঘোষের অভিযোগ

প্রবীর ঘোষ ‘আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ নামক গ্রন্থে ডঃ রশীদ খলিফার বিরুদ্ধে ফালতু অভিযোগ তুলে তাঁকে খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন । প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, “মিশররের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ রাশাদ খলিফা অত্যাধুনিক কম্পিউটারের সাহায্যে কোরআন বিশ্লেষণ করে, বিশ্লেষিত তথ্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কোরআন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রচনা এবং কোরআনই অলৌকিক অস্তিত্বের প্রমাণ । ডঃ খলিফা এ বিষয়ে একটি বইও লিখে ফেলেছেন, ‘দি কম্পিউটার স্পিকন্ গডস্ মেসেজ টু দি ওয়ার্ল্ড’ । খলিফা সাহেবের আবিস্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে মোঃ আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন, ‘আল - কোরআন সর্বশ্রেষ্ট মোজেজা এবং উনিশ’ । ‘মোজেজা’ কথার অর্থ ‘অলৌকিক ব্যাপা’ । ‘মোজেজা’

* কম্পিউটার ও আল কুরআন - ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান (এম. বি. বি. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)

এবং 'উনিশ' শব্দ দুটি নামকরণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সার্থকতা এই যে, আল্লাহে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী খলিফা সাহেব কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন - 'উনিশ সংখ্যাটি পরম বিস্ময়কর ও চরম অলৌকিকত্বের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্তারিত নির্ভূল বর্ণনা' !

কোরআন যে আল্লাহরই রচনা, তাই চুড়ান্ত বিজ্ঞান, এবং অলৌকিক অস্তিত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ - এ'কথা জানিয়ে 'জনাব প্রবীর ঘোষ - কে প্রীতি ও শুভেচ্ছার উপহার হিসেবে' একটি চিঠিসহ বইটি পাঠিয়েছিলেন লেখক ।

সে সময় উত্তর দেইনি । মনে হয়েছিল এ'সব পাগলামির যোগ্য জবাব হতে পারে - উপেক্ষা ।'' (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ১৮৬)

প্রবীর ঘোষ তখন চিঠি পেয়ে উপেক্ষা করেছিলেন । কিন্তু তিনি তাঁর 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' গ্রন্থে ডাঃ রাশিদ খলিফার গবেষণার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নিজেই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন । তিনি খলিফা সাহেবের গবেষণার উত্তর এক কলমও দিতে পারেন নি ।

ডাঃ রাশিদ খলিফা কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণা করে বলেছিলেন যে এরকম গ্রন্থ একবারই লেখা সম্ভব । আর তিনি আল কুরআনের 'উনিশ' সংখ্যার রহস্য উদঘাটন করেছিলেন । তার কোন উত্তর প্রবীর ঘোষ দেননি । তার পরিবর্তে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বোরাকে করে মহাকাশ যাত্রাকে নিয়ে কটাক্ষ করে লিখেছেন,

''খলিফা সাহেব বাস্তবিকই কি মনে করেন - হজরম মোহাম্মদ আল্লাহের পাঠানো 'বোরাক' নামের এক আশ্চর্য মা - প - পা (মানুষ + পশু + পাখি)-র পিঠে চেপে কোটি কোটি বছরের পথ পার হয়ে আল্লাহের কাছে গিয়েছিলেন ? আল্লাহের সঙ্গে মোহাম্মদের কথা - বার্তা হয়েছিল ? আল্লাহ মোহাম্মদকে দুটি মহারত্ন উপহার দিয়েছিলেন - 'নামাজ' ও 'রোজা' ! তারপর আবার কোটি কোটি বছরের পথ ফেরা ! যাতায়াত, আল্লাহের সঙ্গে কথাবার্তা, সব মিলিয়ে মোহাম্মদের সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক মিনিট । বিজ্ঞানী খলিফা সাহেব, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন এমনটা ঘটা সম্ভব ? বিজ্ঞান মেনেই সম্ভব ?

'বোরাক' - এর দেহ ঘোড়ার, মাথা সুন্দরী যুবতীর, পিঠে পাখির ডানা । বোরাকের পাখা ছিল । বোরাক উড়তে পারে । এ'সব ধরে নেবার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় - ডানায় নির্ভর করে শূন্যে উড়তে বায়ুর প্রয়োজন হয় । সেখানে বায়ু নেই, সেখানে ডানার সাহায্যে ওড়া বিজ্ঞানের নিয়মে অসম্ভব । পৃথিবীর বায়ুমন্ডল অতিক্রম করার পর এক ফুট ওড়াও অসম্ভব, সেখানে কোটি কোটি মাইল উড়ল কি করে ? কল্পনার ভর করে ছাড়া ওড়ার আর কোনও ব্যাখ্যা তো পাই না !" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ১৮৭)

পাঠকগণ দেখুন ! প্রবীর ঘোষ বেচারা ডাঃ রাশিদ খলিফার গবেষণার কোন উত্তর দিতে না পেরে বোরাকের ঘটনাকে খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন এবং খলিফা সাহেবের উপর বৃথা ক্রোধান্বিত হয়ে মনের ঝাল মিটিয়েছেন ।

আমরা এখানে বলব, যদি প্রবীর ঘোষ সত্য সত্যই মিশরের বিজ্ঞানী ডাঃ রাশিদ খালিফার গবেষণায় সন্তুষ্ট না থাকেন এবং খলিফা যে কম্পিউটারের মাধ্যমে গণনা করে বলেছেন, এইরকম গ্রন্থ মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় তাহলে প্রবীরবাবু একখানি কুরআনের মতো গ্রন্থ রচনা করে দেখিয়ে দিন না । আমরা জানি প্রবীরবাবু তা পারবেন না । কিয়ামত পর্যন্ত পারবেন না । কারণ মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন,

"এ বিষয়ে যদি তোমরা সন্দিহান থাক যা আমি আমার বান্দার নিকট অবতীর্ণ করেছি তবে তোমরা এইরুপ একটি সুরা নিয়ে এস । আর যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাক ।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৩, পারা ১, সুরা ২)

আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, "বল, যদি এ কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন একত্র সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবু তারা এর অনুরুপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না ।" (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৮, পারা ১৫, সুরা ১৭)

প্রবীর বাবু ! আপনার আছে হিম্মত আল্লাহর এই মহা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ? নেই, আপনার আল্লাহর এই মহা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কোন হিম্মতই নেই । যদি হিম্মত থাকে তাহলে একবার প্রয়াস করে দেখুন ।

পাঠকদের বলি রাখি প্রবীর ঘোষ যে বোরাকের উপর অভিযোগ করেছেন তার জবাব ‘তথাকথিত বুদ্ধিজীবি নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন’ নামক বইয়ে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ।

নাস্তিক প্রবীর ঘোষকে ওপেন চ্যালেঞ্জ

প্রবীর ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত নাস্তিক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি । তিনি ‘আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ নাম দিয়ে স্রষ্টার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন । এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করে দে’জ পাবলিশিং কোলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে । এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে এবং পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্কারণ হয় ডিসেম্বর মাসের ২০১২ সালে ।

এই গ্রন্থে প্রবীর ঘোষ ইসলাম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং ফালতু কথা লিখে পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন । সেইজন্য আমি এই অনুচ্ছেদে নাস্তিক বা তথাকথিত যুক্তবাদী প্রবীর ঘোষকে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ করছি । যদি হিম্মত থাকে এবং সে যদি প্রকৃতপক্ষেই বাপের বেটা হয় তাহলে সে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক এবং প্রকাশ্যে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হোক । এই চ্যালেঞ্জ নিচে দেওয়া হল ঃ

১) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, “ইসলামে ও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন পৃথিবীর আদি মানুষ আদমের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে । ঈশ্বর বিশ্বব্রম্ভান্ড সৃষ্টি করার পর একজোড়া করে প্রাণী তৈরী করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন । আদমের জন্মও একইভাবে ।” (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৪০)

এখানে প্রবীর ঘোষ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলামেও বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । অথচ ইসলামে কোথাও বলা হয়নি যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । এটা প্রবীর ঘোষের মনগড়া বানানো কথা । যদি তা না হয় তাহলে প্রবীর ঘোষ প্রমাণ করুন যে কুরআন শরীফ বা সহীহ হাদীসে কোথায় লেখা আছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । কিয়ামত পর্যন্ত প্রবীর ঘোষ প্রমাণ করতে পারবেন না ।

২) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন ১,২৪,০০০ । এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভুখন্ডে । কেন শুধু আরবে ? আরবেই কি শুধু

পাপীদের বাস ছিল ? নাকি অন্য সব মনুষ্যজাতি ছিল না ?" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৪১)

এই কথাটিও প্রবীর ঘোষের সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যা কথা । ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফে কোথাও বলা হয়নি যে ১,২৪,০০০ পয়গম্বর শুধু আরবেই জন্মেছেন, অন্য কোন দেশে জন্মাননি । প্রবীর ঘোষ যা বলেছেন তার বিপরীত কথাই কুরআন শরীফে লেখা আছে ।

কুরআন শরীফে লেখা আছে, "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রসুল রয়েছে । যখন তাদের কাছে তাদের রসুল আছে, তখন তাদের ওপর আর অত্যাচার হয়না ।" (পারা ১১, সুরা ১০, সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, "আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসুল প্রেরণ করেছি; অর্থসংকট ও দুঃখদারিদ্র পীড়িত করেছে যাতে তারা বিনীত হয় ।" (পারা ৭, সুরা ৬, সুরা আল আন্'আম,)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, "আমি কোন রসুলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী ছাড়া প্রেরণ করিনি; যাতে সে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি মহাপরাক্রন্ত, বিজ্ঞানময় ।" (পারা ১৩, সুরা ১৩, সুরা ইব্রাহীম)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, "আমি তোমার পূর্বে অবশ্য পূর্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম । আর তাদের কাছে এমন কোন রসুল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত ।" (পারা ১৪, সুরা ১৫, সুরা আল হিজর)

কুরআন শরীফের উপরিউক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে অথচ প্রবীর ঘোষ বলছেন যে "খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন

১,২৪,০০০ । এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভুখন্ডে । কেন শুধু আরবে ? আরবেই কি শুধু পাপীদের বাস ছিল ? নাকি অন্য সব মনুষ্যজাতি ছিল না ?”

এখন আমার প্রবীর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ যে তিনি কুরআন শরীফের একটি আয়াত বা একটি সহীহ হাদীস দেখিয়ে দিন যে সেখানে বলা হয়েছে পয়গম্বরগণ শুধু আরবেই জন্মেছেন । তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রমাণ করতে পারবেন না ।

৩) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, “মদিনা আসার পর মোহাম্মদ জঙ্গিবাহিনী গড়ে তুলতে মন দেন । কারণ বুঝেছিলেন, দ্রুত শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে শক্তি প্রয়োগই সেরা পথ । কিন্তু চাইলেই তো আর সেনা বাড়ানো যায় না ! তখন তিনি ভয়ঙ্কর একটা লোভের হাতছানি দিলেন গরিব ও দুর্ধর্ষ মরুবাসীদের উদ্দেশ্যে । তিনি বললেন, ‘জিহাদ’ বা ধর্মযুদ্ধ হল অ-ইসলামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, সবই কোরআনেও স্থান পেয়েছে ।” (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এখানে প্রবীর ঘোষ যা কিছু লিখেছেন তার একটাও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত নয় । তিনি কেবল জাতিগত বিদ্বেষের কারণে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিষোদগরণ করেছেন ।

প্রবীর ঘোষ যদি বাপের বেটা হন, তিনি যদি পিতার অবৈধ সন্তান না হন তাহলে তিনি প্রমাণ করুন যে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) জঙ্গিবাহিনী গঠন করেছিলেন । তবে আমরা জানি প্রবীর ঘোষ যে যুক্তিবাদী সমিতি গঠন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম জঙ্গি সংগঠন । নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজানো । একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা ।

৪) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, “কোরআন - এর সুরা ও আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা ২:২৯৩, ৯:৫, ২৯:৭৩ অনুসারে পৃথিবীর সব মানুষকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ‘মুসলমান’ এবং ‘অমুসলমান’ । এবং আরও বলা হয়েছে, অমুসলমানরা যতদিন না ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে । তাদের সম্পদ লুট করতে হবে ।

আরও বলা হয়েছে, এই যুদ্ধে কোনও মুসলিম শহীদ হলে সে শহীদ হওয়ার পরই বেহেস্তে অর্থাৎ স্বর্গে যাবে। কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সেখানে সর্বোত্তম খাবার, মদ ও অসাধারণ সুন্দরী কুমারী যুবতী ও সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে।....লুটের মালকে ভোগ করার অধিকার কোরআন দিয়েছে জেহাদী লুটেরাদের। (কোরআন ৮:৬৯) কোরআন - এর ২৩:৫, ৬ তে বলা হয়েছে বন্দি রমনীদের সঙ্গে অবাধে যখন ইচ্ছা সঙ্গম করা যাবে।" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এখানেও প্রবীর ঘোষ ইসলাম সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন। প্রবীর ঘোষ যা লিখেছেন তা তিনি হুবহু কোনদিল প্রমাণ করতে পারবেন না। আর তিনি যে বলেছেন স্বর্গে অর্থাৎ জান্নাতে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে এটা প্রবীর ঘোষের মনগড়া কথা। তিনি নিজে হয়তো সমকামিতার জন্য সুন্দর কিশোরের আকাঙ্খা করতে পারেন কিন্তু কুরআন শরীফের কোথাও এরকম বলা নেই 'যে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে'।

আর প্রবীর ঘোষ উপরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ২৯:৭৩ অর্থাৎ সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত অথচ আনকাবুতের ৭৩টি আয়াতই নেই। ৬৯ আয়াতেই সুরা আনকাবুত শেষ তাহলে প্রবীর ঘোষ সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত পেলেন কোথা থেকে ? এটা প্রবীর ঘোষের জালিয়াতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রবীর ঘোষ যদি মনে করেন যে তিনি সত্য কথা লিখেছেন তাহলে তিনি প্রমাণ করুন কোথায় কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে 'যে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে' এবং কোথায় নিরপরাধ অমুসলমানদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? এবং কোথায় কুরআন শরীফে সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত রয়েছে ? তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন না।

আর প্রবীর ঘোষ যে বলেছেন, "কোরআন - এর ২৩:৫, ৬ তে বলা হয়েছে বন্দি রমনীদের সঙ্গে অবাধে যখন ইচ্ছা সঙ্গম করা যাবে।" এই কথা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন না। কুরআন শরীফের যে উদ্ধৃতি প্রবীর ঘোষ দিয়েছেন সেখানে এই কথা লেখাই নেই। আর লুটের মালকে কুরআনে কোথাও বলা হয়নি যে তা জিহাদীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। এসব কথাই প্রবীর ঘোষের মনগড়া বানোয়াট কথা।

৫) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, ‘‘রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামে মনোবিজ্ঞানের এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ইত্যাদি বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করে ।...........এই ধরণের মিসটিক ফেনোমেনার (Mystic Phenomena) কেউ কেউ অসংলগ্ন কথা বলে, কারও বা মুখ থেকে এই সময় স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসে কবিতার ছন্দে নানা ধর্মীয় উপদেশ, কেউ কেউ মনে করেন পরমপিতা আল্লাহ বা পরমব্রম্ভের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে । যদিও মনোরোগ চিকিৎসকরা একটিমাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে সাধারণত পৌঁছতে চান না, তবুও তাঁদের অনেকেই মনে করেন - যিশু হযরত মোহাম্মদ, চৈতন্যদেব ছিলেন ‘রিলিজিয়াস মিসটিক’ বৈশিষ্টের অধিকারী ।’’ (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ১১১)

এখানে প্রবীর ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে যীশু খ্রীষ্ট বা হযরত ইসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামক একধরণের রোগের শিকার ছিলেন । কি জঘন্য মিথ্যাচার ! মহানবী (সাঃ) ও যীশু খ্রীষ্ট কোন মানসিক রোগের শিকার ছিলেন না এটা আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি ।

আমার তরফ থেকে প্রবীর ঘোষ এবং তাঁর যুক্তিবাদী সমিতিকে ওপেন চ্যালেঞ্জ রইল আমি যে এই পাঁচটি পয়েন্টে প্রবীর ঘোষ নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করে দিন । এর জন্য যদি বিতর্কসভার আয়োজন করতেও হয় তাহলেও আমরা প্রস্তুত আছি । আছে প্রবীর ঘোষের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত । আছে তার বুকের পাটা ? আমরা জনি প্রবীর ঘোষ বই পুস্তক লিখে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে কি কিন্তু সে খোলাখুলিভাবে আমাদের সম্মুখীন হবে না । সে বিষপান করে আত্মহত্যা করে মরে যাবে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাবে, রেল লাইনে কাটা পড়তে প্রস্তুত থাকবে কিন্তু আমি যে চ্যালেঞ্জ করেছি তার জবাব সে কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবে না ।

পাঠকগণ অপেক্ষা করুন খুব শীঘ্রই প্রবীর ঘোষের ‘আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ গ্রন্থের জবাব ‘তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন’ নামে প্রকাশ করব ইনশাল্লাহ । সেখানে দাজ্জাল প্রবীর ঘোষের ধর্ম ও আল্লাহ তথা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যত অভিযোগের টু দি পয়েন্ট জবাব পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ।

উপসংহার

গত কয়েক দশক আগে পর্যন্ত নাস্তিক্যবাদীরা একটু বেশী মাত্রায় লাফালাফি করতেন । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি হতে না হতেই একেবারে সভ্যতার সম্মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে । আজকের যুগে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব আবিস্কারের ফলে নাস্তিকতাবাদ সবচেয়ে বড় কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে । বিজ্ঞানের আবিস্কার যত বেড়েছে ধর্মের তত্ত্ব ও মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ততই প্রকট হয়ে উঠেছে । কারণ আজকের বিজ্ঞান যা চূড়ান্ত আবিস্কারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা আজ থেকে মহান আল্লাহ পাক চোদ্দশত বছর আগে বলে দিয়েছেন । এমন এমন তত্ত্ব তিনি কুরআন শরীফের মধ্যে মানুষকে অবগত করিয়েছেন যা মানুষ গত কয়েক দশক আগেও পর্যন্ত জানত না এবং সেই আবিস্কার সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না ।

নাস্তিক্যবাদের সূচনা হয়েছিল গ্রীক দর্শনের প্রভাবেই । এবং তা বিকশিত হয়েছিল মার্কস, এঙ্গেলস, নিৎসে, ফ্রয়েড প্রভৃতি চিন্তাবিদ্দের নিরীশ্বরবাদী চিন্তাভাবনার প্রয়োগের ফলে । এবং এই নাস্তিকতার সপক্ষে সবচেয়ে পড় সমর্থন এসেছিল বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব আবিস্কারের ফলে । কিন্তু আজ বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা প্রমান করে দিয়েছেন যে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব কিছুটা সত্য হলেও অধিকাংশই বিজ্ঞান বিরোধী এবং খামখেয়ালী তত্ত্বে ভরপূর যার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের কোন মিল নেই ।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব যখন ভূল প্রমাণ হয়ে গেল তখন নাস্তিক্যবাদীদের পুরো তত্ত্বই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় । এবং মার্কস, এঙ্গেলস, নিৎসে, ফ্রয়েড প্রভৃতি চিন্তাবিদ্দের নিরীশ্বরবাদী চিন্তাভাবনা একাধারে খন্ডিত হতে থাকে বিজ্ঞানের নানান আবিস্কারের ফলে । ফলে নাস্তিক্যবাদ চিলে কোঠায় উঠে পড়ে । যার ফলে নাস্তিকতাবাদ বিংশ শতাব্দীর সব থেকে বড় কুসংস্কারে পরিণত হয় ।

নাস্তিক্যবাদ কুসংস্কার প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু নাস্তিক আমাদের সমাজে বিরাজ করছে এটা অবশ্যই সত্য, কেননা আজকের যুগে নাস্তিকতাই একমাত্র মাধ্যম যেখানে সমাজকে লুটে পুটে খাওয়া যায় । কেননা, নাস্তিকদের কাছে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই এবং তারা এই ধারণা পোষন করে থাকে যে মানুষের কোন কৃতকর্মের ফল মৃত্যুর পরে ভোগ করতে হবে না । সেজন্য কিছু ভোগবাদী নাস্তিক সমাজে বিরাজ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিরাজ করবে ।

নাস্তিকদের কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন

নাস্তিক্যবাদীরা বলেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ বলে কেউ নেই তাই তাঁদেরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হল,

১) সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ বলে কেউ নেই তার প্রমাণ কি ? কিসের ভিত্তিতে আপনারা বলে থাকেন যে আল্লাহ বলে কেউ নেই ?

২) বর্তমানে বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে বিশ্ব বক্ষান্ড একটি কঠিন বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে । অর্থাৎ জগৎ একটি সময় সৃষ্টি হয়েছে । তাহলে এই জগৎ সৃষ্টির আগে কি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বলে কিছুই ছিল না ? যদি কিছুই না থাকে তাহলে কোন পদার্থের মধ্য বিস্ফরণ হল ? যে পদার্থটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি হল সেই পদার্থটি সৃষ্টি হল কি করে ?

৩) এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মধ্যে এক অদ্ভুত নিয়ম শৃঙ্খলা বিরাজ করছে । তাহলে কি শুধু শুধুই এই নিয়ম শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেল ? বাস্তব জগতে আমরা দেখতে পাই কোথাও কোন বিস্ফোরণ ঘটলে সব শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় । সব কিছু তছনছ হয়ে যায় । তাহলে জগৎ সৃষ্টির আগে যখন সেই মহাবিস্ফোরণ ঘটে জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তাহলে একটি বিস্ফোরণেই কিভাবে এতকিছু শৃঙ্খলা চলে এল ?

৫) বিগ ব্যাং থিওরী আজ বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত থিওরী বা তত্ত্ব । এর মধ্যে আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই । সকল বিজ্ঞানীরাই এই তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন । এই থিওরীতে বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব - ব্রহ্মান্ড সম্প্রসারণশীল । কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে যে, "খোদাদ্রোহীরা কি একথা জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় ছিল, তারপর আমরা তাকে আলাদা আলাদা (পৃথক) করে দিয়েছি এবং আমরা পানি থেকে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি । তবুও তারা বিশ্বাস করবে না ?" (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৩০)

তাহলে বিজ্ঞানীরা স্যাটালাইটের মাধ্যমে আজকে প্রমাণ করলেন বিশ্ব - ব্রহ্মান্ড সম্প্রসারণশীল । এই তত্ত্ব আজ থেকে একশত বছর আগে মানুষের জানা ছিল না । তাহলে আজ থেকে প্রায় চোদ্দশত বছর আগে কি করে এই তত্ত্ব কুরআন শরীফ আমাদের বলে দিল ?

৬) তসলিমা নাসরিন বলেছেন, ‘‘আমি যখন কোরান পড়েছিলাম, তখন তাতে দেখেছি, কোরানে বলা হয়েছে - ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে’ ।’’ এই কথা কুরআনের কোন সুরার, কোন আয়াতের মধ্যে আছে ?

৭) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী পৃথিবীর প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় ধর্মগ্রন্থে করা হয়েছে তাঁর জন্মের বহুকাল আগে থেকেই । তাহলে ধর্মীয় মহাপুরুষগণ আগে থেকে কিভাবে হযতর মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে ফেললেন ?

৮) এতদিন পর বিজ্ঞানীরা জ্বিনতত্ত্ব () সম্পর্কে আবিস্কার করলেন । তাহলে কি করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে এই জ্বিনতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবগত করিয়েছেন ।

৯) আজকের যুগে বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করলেন এই বিশ্ব - ব্রহ্মান্ডে যা কিছু আছে তা নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে । এই কথা কুরআন শরীফে আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে কি করে বলে দেওয়া হল ? কুরআন শরীফে আছে,

‘‘লাস শামসু ইয়ামবাগী লাহা আন তুদরীকাল ক্বামারা ওয়াললাইলী সাবিকুন নাহার, কুল্লুন ফি ফালাকিঁই ইয়াসবাহুন ।’’ (সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০)

অর্থাৎ সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং অন্তরিক্ষে যা আছে তা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন (সন্তরণ) করে ।

১০) আজকের যুগে বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যে চন্দ্রে নিজস্ব আলো নেই সূর্যের নিজস্ব আলো আছে । এই কথা কুরআন আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে কি করে বলে দিল ?

১১) কুরআন শরীফে ১০০০টিরও বেশী বিজ্ঞানময় আয়াত আছে । অথচ কুরআন শরীফে একটাও বিজ্ঞান বিরোধী কথা লেখা নেই । এটা কি করে সম্ভব হলো ?

১২) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, "ইসলামে ও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন পৃথিবীর আদি মানুষ আদমের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে ।" এই কথা কুরআন শরীফ বা হাদীসের মধ্যে কোথায় লেখা আছে ?

১৩) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, "মদিনা আসার পর মোহাম্মদ জঙ্গিবাহিনী গড়ে তুলতে মন দেন । কারণ বুঝেছিলেন, দ্রুত শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে শক্তি প্রয়োগই সেরা পথ । কিন্তু চাইলেই তো আর সেনা বাড়ানো যায় না ! তখন তিনি ভয়ঙ্কর একটা লোভের হাতছানি দিলেন গরিব ও দুর্ধর্ষ মরুবাসীদের উদ্দেশ্যে । তিনি বললেন, 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ হল অ-ইসলামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, সবই কোরআনেও স্থান পেয়েছে ।" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এই কথা ইসলামের কোন গ্রন্থে লেখা আছে ?

১৪) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামক একধরণের রোগের শিকার ছিলেন । এই কথা তিনি কিসের ভিত্তিতে বললেন ?

১৫) ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে আজকের যুগে বিজ্ঞানীরা নিখুঁতভাবে আবিস্কার করলেন । তাহলে কুরআন শরীফে আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে কি করে তা নির্ভূলভাবে তথ্য দেওয়া হল যা ভ্রূণবিজ্ঞানী ড. উইলিয়াম কিথ মূরও অস্বীকার করতে পারেন নি ?

১৬) হিটলার সারা জীবনে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে । আল্লাহ বলে যদি কেউ না থাকে বা পরকালে বিচারের কোন ব্যাবস্থা যদি না তাকে তাহলে তো সে বাজিমাত করে গেল । তাকে কেউ শাস্তি দিতে পারল না । এর ব্যাখ্যা নাস্তিক্যবাদীরা করবেন নি করে ?

১৭) পৃথিবীতে বহু মানুষ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত । প্রশাসতন তাদের কেশাত্র স্পর্শ করতে পারে না । তাদের বেশীর ভাগই স্বাভাবিকভাবেই মারা যায় । তাদের বিচার হবে কি করে ? যদি পরকালে বিচার ব্যাবস্থা না থাকে তাহলে তারা তো বাজিমাত করে নিল ।

১৮) এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে এক অদ্ভুত পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে । যদি সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ না থাকে তাহলে এই পরিকল্পনা করল কে ?

১৯) এই বিশ্ব - ব্রহ্মান্ডে যে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা একটি বারের জন্যও কেন এই শৃঙ্খলার বিপরীত হয় না ?

২০) নাস্তিক্যবাদীরা বলেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এবং অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে । তাহলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকেই যে বলি তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন । এতে আপত্তি কোথায় ?

২১) মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআন শরীফের মতো একটি সুরা তৈরী করতে । এই চ্যালেঞ্জ চোদ্দশত বছর হয়ে গেল তাহলেও কেন নাস্তক্যবাদীরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি ?

২২) নাস্তিক্যবাদীরা বলেন, কুরআন শরীফ মানুষের তৈরী । আমরা বলব আপনারাও তো মানুষ একখানা কুরআনের মতো গ্রন্থ প্রনয়ণ করে ফেললেন না ?

২৩) মানুষ কেন মরণশীল ? মানুষ কেন চিরকাল বেঁচে থাকে না ? মানব শরীরে কি এমন বৈশিষ্ট রয়েছে যে একদিন না একদিন তাকে মরতেই হয় ? এই মরণকে কেন রোধ করা যায়না ?

২৪) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যদি রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামক একধরণের রোগের শিকার ছিলেন তাহলে কি করে তিনি এত এত মানুষের মন জয় করে নিলেন এবং সুবিশাল সাম্রাজ্য কয়েম করলেন ?

মূল্যবান উক্তি

বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমিত ও স্বল্প। মানুষ সৃষ্টি জগতকেই বুঝে শেষ করতে পারে না, সে তার সীমিত জ্ঞানে মহান স্রষ্টাকে বুঝবে কি করে ?"

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানেস তাঁর মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে স্বীকার করে গেছেন, "মহাবিশ্বকে কোন ক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে বোঝান যায় না।"

১৯০০ বছর পূর্বে দার্শনিক সেন্ট পল বলেছেন, "আল্লাহর আদেশেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব দৃশ্য সমস্ত জিনিসই অদৃশ্য জিনিস থেকে তৈরী।"

সর্বকালের সেরা বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটন বলেছেন, "একমাত্র চরম বুদ্ধিমান ও পরম ক্ষমতাশালী এক শক্তির নির্দেশেই সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং ধুমকেতু এ আশ্চর্য সুন্দর জগৎ সৃষ্টি হতে পারে। অন্ধের যেমন বর্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তেমনি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ কিভাবে সকল বস্তু ধারণ করেন, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।"

আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন, "ওয়া লিল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম, আযাবু জাহান্নাম, ওয়াবিসাল মাসীর" অর্থাৎ "অস্বীকার করে যার আপন পালনকর্তাকে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, সেটা কতোই না জঘন্য স্থান।" (আল কুরআন, সুরা মূলক, আয়াত ঃ ৬)

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিত)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।

(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605

(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।

(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।

(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।

(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029

(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012

(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668

(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।

(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668

(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পাড়ুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225

(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395

(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560

(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943

(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353

(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।
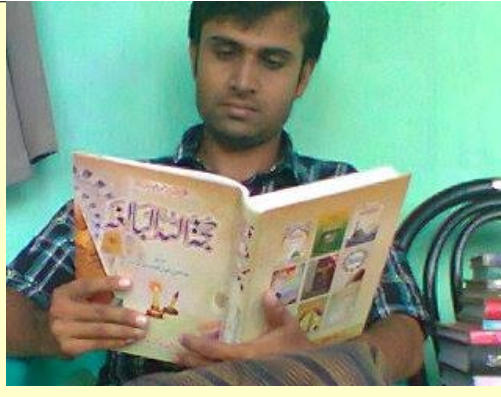
লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da'wah and Education Academy